প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : চৈত্র, ১৩৬২
তৃতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪
চতুর্থ মুদ্রণ : শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
[illegible] পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শিল্পী : ৺
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান,
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
[illegible] ফোটোটাইপ স্টুডিও
—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা চৈতালী ঘূর্ণি হারানো সু
শ্রেষ্ঠ গল্প আরোগ্য-নিকেতন আমার কালে
কথা আমার সাহিত্য-জীবন শিলাসন কামধেনু
দ্বীপান্তর রাইকমল ধাত্রীদেবতা বিচারক
সপ্তপদী ডাকহরকরা রচনা-সংগ্রহ ১ম

চাঁপাডাঙার বৌ

মর পথে পাশের বড গ্রাম [illegible]

। একজন ঢাকী বড় এক[illegible]

সঙ্গে কাঁসি ও শিঙা। দলটা[illegible] দেখা [illegible]।

দেবগ্রামে গাজন নাই। নবগ্রামের গাজন[illegible] এ গ্রামে [illegible]।

এবার ব্যাপারটা নতুন।

দক্ষিণ পাডার মণ্ডলবাড়ি হইতে [illegible]

দাঁড়াইল।

গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ মণ্ডলবাড়ি। মাটির ঘর, টিনের চাল, পাকা মেঝে; বারান্দায় সুন্দব-গড়নেব কাঠের খুঁটি। সেতাব ও মহাতাপ মণ্ডলের বাড়ি। বধূ দুইটি দুই ভায়ের স্ত্রী—কাদম্বিনী ও মানদা। কাদম্বিনী ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী এবং শ্যামবর্ণে চমৎকার লাবল্যময়ী মেয়ে। মানদা মাথ একটু স্থূলাঙ্গী। কাদম্বিনী নিঃসন্তান, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, মান সতেরো-আঠারো—একটি সন্তানের জননী মানদা।

ওদিকে গাজনের সঙের দল অন্য একটা রাস্তায় ভাঙিয়া ঢুকি শুরু করিল। ঢাকের বাজনার শব্দ বাঁকের আড়ালে পড়িয়া আসিল।

মানদা বলিল, মরণ! ও-রাস্তায় ঢুকে গেল যে মড়ার দল।

কাদম্বিনী গবেষণা করিয়া বলিল, বোধ হয় ও-পাড়ায় মোটা

মোড়লের বাড়ি? কেন? আমাদের বাড়ির চে

তর বেশি না কি?

সের খাতির তো আছে। তা ছাড়া দিতে-থুতে মোটা

যে খুব।

? সে যে গেল শ্বশুরকে দেখতে! মানুষ বাপের অসুখ—
তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বলিল, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়
শুধু শুধু আর মিছে কথাগুলো বোলো না তুমি!

কি বলছিস তুই?

বলছি গো, বড় মোল্যান। সে যে যায় নাই, তা তুমি জানো।

জানি?

না? যদি না জান তবে আমার যাওয়া তুমি বন্ধ করলে ক্যানে?

—এই গরমে ছ কোশ পথ খোকাকে নিয়ে যাবি, খোকার অসুখ-বিসুখ করবে, তাই বারণ করলাম। বললাম—ঠাকুরপো দেখে আসুক।

—মিছে কথা। আমি জানি, আমি বুঝি। বুঝেছ, আমি সব বুঝি। আমার বাপের বাড়ি যাবে? তার চেয়ে চারদিন গাজনে নেশাভাঙ করুক, ভূতের নাচন নাচুক, সেও ভাল। আমি সব বুঝি।

মানদা হন-হন করিয়া চলিয়া গেল—খামারবাড়ি পার হইয়া বাড়ির ভিতর দিকে। খামারবাড়ির ও-দিকে পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা। সেই দরজাটাকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কাদম্বিনী দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকটা ভাবিয়া দেখিয়া বলিল, তুই ঠিক জানিস নোটন, ছোট মোড়ল আজ কদিন নবগ্যারামের গাজনে মেতে সেইখানেই রয়েছে?

—এই দেখ! আমি নিজে চোখে দেখে এয়েছি গো। রোজ দেখা হচ্ছে।

—বলিস নাই ক্যানে?

—তার আর বলব কি বল? আর কি বলে, ছোট মোড়ল বললে—নোটন, বলিস না বাড়িতে, তা হলে দোব কিল ধমাধম। ছোট মোড়লের ড়া, তেমুনি ভারী, আষিঢ়ে তাল।

কাদম্বিনী বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে বলিল, বড় মোল্যান!

মোড়ল কিন্তু চাপাডাঙা গিয়েছিল।

—গিয়েছিল ? গিয়েছিল তো নবগ্রামে থাকল কি করে ?

—ওই দেখ ! ছ কোশ ছ কোশ বারো কোশ রাস্তা ছো[illegible]
কাছে কতক্ষণ ! যেদিন সকালে গিয়েছে, তার ফেরা দিন ফি[illegible]
নবগ্যেরামেই জমে যেয়েছে। ভাঙ খেয়েছে, বোম্-বোম্ করছে
আছে। শোনলাম, দশ টাকা চাঁদা দিয়েছে।

—দশ টাকা ?

—হ্যাঁ।

—দশ টাকা ?

—হ্যাঁ গো। ছোট মোল্যান তিরিশ টাকা দিতে দিয়েছিল বাপের
বাড়িতে। তা থেকে দশ টাকা ছোট মোড়ল খয়রাত করে দিয়েছে।

—তোকে কে বললে ?

—কে আবার ! খোদ ছোট মোড়ল নিজে। সে সেই প্রথম দিনের
কথা। যে দিনে যায় সেই দিনের। নবগ্যেরামে চাঁদা দিয়ে-টিয়ে ভাবছে—
কি করি ! আমার সাথে দেখা। বলে—দশ টাকা তু ধার এনে দে নোটন।
বলে দোব, বড় বউ তোকে দেবে। তা কি করব ? এনে দিলাম।

বড় বউ কাদম্বিনীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাসিয়াই সে বলিল,
আর কাউকে এ কথা বলিস না নোটন, তোর টাকা আমি দোব।

বলিয়া সে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

বাড়ির উঠানে ছোলা কলাই মেলিয়া দেওয়া রহিয়াছে। পাশে দুইটা
ঝুড়িতে কতক তোলা হইয়াছে। বধূ দুইটি ছোলা তুলিতে তুলি[illegible]
গিয়াছিল, দেখিয়াই বোঝা যায়।

একটা ছাগল সেগুলা নির্বিবাদে খাইতেছে। দুইটি ছানা পিছনে দাঁড়াইয়া
আছে, লাফাইতেছে।

ছোট বউ মানদা একটা দাওয়ায় দেওয়ালে ঠেস দি[illegible]
কাঁদিতেছে।

বড় বউ ঘরে ঢুকিয়াই ছাগলটাকে তাড়াইল—মর্ মর্ সর্ব
বেরো, দূর হ।

ছাগলটা পলাইল।

বড় বউ ঝুড়ি টানিয়া লইয়া বলিল, তুই বসে বসে দেখলি মানু? তাড়ালি না?

—আমার ইচ্ছে। আমার খুশি।

—তোর খুশি?

—হ্যাঁ। খুশি। বলি, কেন তাড়াব? কি গরজ? এ সংসারে আমার কি আছে? কি হবে?

বড় বউ তুলিতে তুলিতে বলিল, এত রাগ করে না। দিনে দুপুরে কাঁদে না, কাঁদতে নাই। আর তার কারণও নাই। নোটনকে তুই জিজ্ঞাসা করে আয়, ঠাকুরপো চাঁপাডাঙা গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, একদিনের বেশি থাকে নাই। সেখান থেকে এসে নবগ্রামে ডেরা নিয়েছে। আয়, ছোলা কটা তুলে নে।

—পারব না আমি।

—পারতে হবে। আয়।

—তুমি মহারানী হতে পার, আমি তোমার দাসী নই। সংসার চুলোয় যাক, আমার কি?

একটা ঝুড়ি ইতিমধ্যে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেটাকে কাঁখে তুলিয়া ঘরে লইয়া যাইবার পথে মানদার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল, টাকা তিরিশটা চাঁপাডাঙায় তালুয়ের হাতে পৌঁচেছে মানু। ঠাকুরপো দিয়ে এসেছে। সংসার চুলোয় গেলে, সে আর কখনও পাঠানো চলবে না। যা কলাইগুলো তুলে নে। কেলেঙ্কারি বাড়াস নে!

সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

চমকিয়া উঠিল। ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি বললে? ললে?

ভিতর হইতেই কাদু জবাব দিল, কিছু বলি নাই। বলছি, যা তুলে ফেল্।

। ঘরের দিকে আগাইয়া গেল—না, টাকা বলে কি বললে তুমি বল?

কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, বলছি টাকা নয় রে—তারিখ, তারিখ—আজ মাসের ক তারিখ বলতে পারিস? বলিয়াই সে মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিবার ইঙ্গিত দিয়া আঙুল দিয়াই দেখাইয়া দিল। নিজে জানালা দিয়া উঁকি দিল।

ঘরের মধ্যে সেতাব খাতাপত্র লইয়া হিসাব করিতেছিল। বয়স বছর বত্রিশেক। শুকনা শরীর, বিরক্তি-ভরা মুখ। এক জোড়া গোঁফ আছে। সে ঘাড় উঁচু করিয়া কান পাতিয়া কথা শুনিতেছে। কথা বন্ধ হওয়ায় সে সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পা টিপিয়া আসিয়া জানালার পাশে আড়ি পাতিল। ওদিকে পাশের দরজা ঠেলিয়া বড় বউ ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, ওকি হচ্ছে কি?

সেতাব চমকিয়া উঠিল এবং উত্তরে প্রশ্ন করিল, কি?

—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। ওখানে অমন করে আড়ি পাতার মত দাঁড়িয়ে কেন?

—আড়ি পাতব কেন?

—তবে করছ কি?

—কিছু না। সে ফিরিয়া আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। তারপর বলিল, ভর্তি দুপহরে তোমরা দুই জায়ে ঝগড়া লাগিয়েছ কেন বল তো? পয়লা বোশেখ—শুভদিন, বলি তোমরা ভেবেছ কি? বলি ভেবেছ কি?

কথা বলিতে বলিতেই তাহার কথার তাপ বাড়িতে লাগিল।

ওদিকে ঢাকের বাজনা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া লঠিতে লাগিল।

বড় বউ কাদম্বিনী বলিল, ঝগড়া? কে ঝগড়া করছে? কার সঙ্গে? কোথায় দেখলে তুমি ঝগড়া? আমাদের দুই জায়ে একটু জোরে কথা বলছি। তার নাম ঝগড়া? অমনি তুমি আড়ি : গিয়েছ?

—শুনব না? ছোট বউমা বললে না—টাকা বলে কি তুমি ঢাকলে—না, টাকা নয়, তারিখ তারিখ বলে? আমি ে বল তো পায়ে হাত দিয়ে?

—হায় হায় হায়! খুট করে কোন শব্দ উঠলে বেড়াল ভাবে ইঁদুর। চোর ভাবে পাহারাওয়ালা। আর টাকার কথা শুনলে তোমার টনক নড়ে। ওই শুনেই তুমি আড়ি পাততে গিয়েছ!

—যাব না? টাকা কত কষ্টে হয়, কত দুঃখের ধন, জান? কই, সাত হাত মাটি খুঁড়ে টাকা তো টাকা—একটা পয়সা আনো দেখি! আমি বহু কষ্টে গড়েছি সংসার। বাবার দেনা শোধ করেছি, দশ টাকা নাড়াচাড়া করছি। মা-লক্ষ্মীকে পেসন্ন করেছি। সেই টাকা আমার তছনছ করে দেবে তোমরা? তার চেয়ে—তার চেয়ে—

—তার চেয়ে টাকার মাপে তোমার চামড়া কেটে দিতে কম দুঃখ পাও তুমি, তা আমি জানি। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাক, তোমার টাকা কেউ অপব্যয় করে নি।

—না, করে নি! আমি জানি না, বুঝি না কিছু? বেশ তো, টাকা টাকা করে কি বলছিলে, বল না শুনি?

—বলছিলাম মানুর বাপের অসুখ, ঠাকুরপো চাঁপাডাঙা দেখতে গেল—পাঁচটা টাকাও তো দিতে হত পথ্যির খরচ বলে। তাই মানুকে বললাম, ভাসুর না দেক স্বোয়ামী না দেক—তুই তো নিজে নাক-ছাবি বেচেও দিতে পারতিস্? তোরই তো বাপ। তাই ঝেঁকে উঠল মানু।

—উঁহু। গড়ে বললে কথা। মিথ্যে বললে। বল আমার পায়ে হাত দিয়ে।

—তুমি অতি অবিশ্বাসী, অতি কুটিল। ছি-ছি-ছি—

—আমি অবিশ্বাসী কুটিল?

—হ্যা, শুধু তাই না। তুমি কৃপণ, তুমি অভদ্র।

দাদু!

ছোট বউয়ের বাপের অসুখে দশ টাকা তত্ত্ব বলে দেওয়া উচিত ছিল ...মার? ভিখিরীকে ভিক্ষে দিতে তোমার বুক টনটন করে। ছি টাকা-পয়সাকে।

...র আওয়াজ খুব জোর হইয়া উঠিল।

বড় বউ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেতাব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই মরেছে! ঢাক, আবার আমার বাড়িতে কেন রে বাবা? এই মরেছে!

সে দরজা খুলিয়া উঁকি মারিল।

দেখিল, দাওয়ায় বড় বউ ও ছোট বউ দাঁড়াইয়া আছে।

ওদিকে দরজা দিয়ে উঠানে গাজনের সঙ প্রবেশ করিতেছে।

শিব সাজিয়া মহাতাপ নাচিতেছে। লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ শরীর।

শিব তাহাকে খুব ভাল মানাইয়াছে। দাড়ি-গোঁফ-জটায় তাহাকে চেনা যায় না।

সঙের দল গান গাহিতে গাহিতেই প্রবেশ করিল। তাহারা গাহিতেছে—গাহিতেছে পার্বতীর সখী, জয়া বিজয়া।

শিবো হে, শিবো হে, অ শিবো শঙ্কর হে!
হাড়মালা খুলে ফুলোমালা পরো হে,
অ শিব শঙ্কর হে!
হায়—হায়—হায়—হায়—
ফুল যে শুকিয়ে যায়—
গলায় বিষের জ্বালায় শিবো জরজর হে!
অ শিবো শঙ্কর হে!—

শিব :— তা থৈ থৈ তা থৈ থৈ—বম্ বম্
হর হর—সব হর হে!— (নাচন)

জয়া বিজয়া :—

হায় রে হায় রে—
মদন পুড়ে ছাই রে—
লাজে কাঁদে পার্বতী,
ঝর ঝর হে—!
গাজনে নাচন শিবো সম্বর হে!
শিব শঙ্কর হে!

মহাতাপও এবার যাও যাও, সব রাহার যাও। নেহি যায়েগা ; হাম নেহি যায়েগা। া। ভাগো।

সেতাব ওদিকে বারান্দায় আপন মনেই পায়চারি করিতেছিল এবং বলিতেছিল, হুঁ : হুঁ ! যত সব কেলেঙ্কারি ! হুঁ ! মান-সম্মান আর রইল না। হুঁ !

ধমক খাইয়া সঙের দল বাহিরে চলিয়া গেল।

রাস্তার উপর আসিয়া দলের মধ্যে বচসা শুরু হইয়া গেল। নন্দী নিজের টা খুলিয়া ফেলিয়া ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, তখুনি বলেছিলাম—পাগলাকে দলে নিও না। তখন সব বললে—দশ টাকা চাঁদা দেবে। চেহারা ভাল, গানের গলা ভাল। এখন হল তো ?

বিজয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, অঃ বোঁচার না পেয়ে রাগ খুব !

—খবরদার বলছি চ্যাংড়া ছোঁড়া। একটি চড়ে বেঁকিয়ে দেব।

—চুপ চুপ, ঝগড়া কোরো না। চল, বাড়ি চল সব। শিব সাজিয়ে নেব চল। উ যে এমন করবে তা কে জানে। জামা-কাপড়ে আধুনিক ম্যাট্রিক-ফেল চাষীর ছেলে ঘোঁতন

—তা—কে জানে! কেন, মহাতাপের মাথা খারা থকে, কেউ জান না কি ?

বিজয়া সাজিয়াছিল যে ছেলেটা, সেটা দেখিতে কুৎ গলো। সে আবার হাসিয়া বলিল, বোঁচা শিব সাজলে আ মনা হবে বিজয়া। মুখে কাপড় দিয়ে সে হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ উচ্চ ক্যাঁ—চ শব্দ করিয়া মণ্ডল-বাড়ির বাহিরের দ লা ঝাড়িয়া সেতাব বাহির হইয়া আসিল।

জনতা স্তব্ধ হইয়া গেল। এ উদ্ধার-মুখের দিকে ঘোঁতনই ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, চল চল। বলিয়া সে সর্বাগ্রে হন-হন করিয়া চলিতে শুরু করিল।

তাহার পিছনে পিছনে সকলে।

সেতাব ডাকিল, এই ঘোঁতন, এই! এই! এই!

দলের একজন বলিল, ঘোঁতনদা ডাকছে যে বড় মোড়ল!

—ডাকুক। মরুক চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে। বেটা আমার কাছে ধান পাবে। চলে আয়।

সে হন-হন করিয়া চলিতে লাগিল।

সেতাব রাস্তায় নামিল।

ঘোঁতনা তাহার কথা শুনিল না দেখিয়া রাগিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, নালিশ করব আমি।

ঘোঁতন এবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কর। মহাতাপ পাওনা ধান ছেড়ে দেবে আমাকে কড়ার করায় তবে ওকে আমি শিবের পার্ট দিয়েছি। লোকে সাক্ষী দেবে। বোঁচা বল্ না রে!

সেতাব চমকিয়া উঠিল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হন-হন করিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল—উঠানে একটা জল-চৌকির উপর মহাতাপ বসিয়া আছে এবং কৃষাণ নোটন উঠানের কোণের পাতকুয়া হইতে জল উঠাইতেছে; রাখালটা মাথায় ঢালিতেছে। মহাতাপ খুব আরাম করিয়া স্নান করিতেছে; মধ্যে মধ্যে মুখে জল লইয়া ফু-ফু করিয়া উপরে আশেপাশে ছুঁড়িতেছে। বড় বউ দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে গামছা। পাশে দড়ির আলনায় কাপড়। বড় বউয়ের কোলে মহাতাপের পাঁচ বছরের হৃষ্টপুষ্ট ছেলে—মানিক।

বাপের জল-কুলকুচার রকম দেখিয়া সে খুব হাসিতেছে।

সে বলিল, বাবা কি করছে? ব-মা?

কাদু বলিল, নোটন ও রাখালকে, ওই হয়েছে, ঢের হয়েছে। আর থাক।

মহাতাপ বলিল, উঁহু। হয় নাই, এখনও হয় নাই। ঢাল্, নোটনা, ঢাল্।

বলিয়াই জল ছুঁড়িল—ফুঃ!

বাবা কি করছ?

গঙ্গা ঝরতা হ্যায় রে বেটা। শিবকে শির 'পর গঙ্গা ঝরতা হ্যায়।
মহা
।ান ধরিয়া দিল--

ঝর ঝর ঝর ঝর গঙ্গা ঝরে
শিরোপরে গঙ্গাধরের রে!
ঝর ঝর ঝর ঝর—ফুঃ!
আমি শিব রে বেটা, হম শিব হ্যায়।

—শিব হ্যায়?

—হ্যাঁ, তু বেটা গণেশ। মাথায় হাতির মুণ্ডু বসিয়ে দেব।

সেতাব দাঁড়াইয়া খানিকটা দেখিল, তারপর, হু। ছি-ছি-ছি! ছিঃ-ছিঃ! বলিয়া উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল এবং দাওয়ায় গিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিবার সময় দাঁড়াইয়া বলিল, ঘরের লক্ষ্মীর চুলের মুঠো ধরে বনবাসে দেওয়ার পথ ধরেছিস তুই মহাতাপ। ছিঃ!

এবার মহাতাপ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল।—কেয়া?

বড় বউ কাদম্বিনী শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকিল, মহাতাপ!

মহাতাপ আগাইয়া আসিয়া বলিল, নেহি নেহি নেহি। চামদড়ি কিপ্‌টে কেয়া বোলতা হ্যায়—জানতে চাই আমি। ঝুট বাত হাম নেহি শুনেগা।

বড় বউ এবার মহাতাপের ছেলেকে নামাইয়া দিয়া আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল—ছি, বড় ভাই গুরুজন, তাকে এমনি কথা বলে! কতদিন বারণ করেছি না?

মহাতাপ বলিল, ও মিছে কথা কেন বলবে? আমি
মুঠো ধরে বনবাসে দোব—আমি!

সকলে অবাক হইয়া গেল।

সেতাব বলিল, তোর মাথা খারাপ, বুদ্ধি কম—শেষে
নাকি? বলছি ঘরের লক্ষ্মীর কথা। বড় বউয়ের কথা কখন ব

—কখন বললাম! বড় বউই তো ঘরের লক্ষ্মী।

বড় বউ হাসিয়া ফেলিল—মরণ আমার। নাও, খুব
এখন মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে খাবে চল। এস।

—যাবে, তার আগে একটু দাঁড়াও। মহাতাপ টাকা পেলে কো...
দশ টাকা চাঁদা দিয়েছে গাজনের দলে সঙ সাজবার জন্যে—তুমি দিয়েছ?

—নেহি। ছোট বউ, ছোট বউ দিয়েছে।

বড় বউ মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ছোট বউকে দিয়েছিলাম তালুইয়ের অসুখে তত্ত্ব করবার জন্যে। মহাপুরুষ তাই দাতব্য করেছেন গাজনের দলে। হ্যাঁ, সে টাকা আমি দিয়েছি। তোমার সংসারের একটা দানা কি এক টুকরো তামা আমার কাছে বিষের মত; তোমার সংসারে দরকার ছাড়া যে আমি কিছুই ছুঁই না, সে তুমি জান। আমার মায়ের গয়না পেয়েছি, সেই বিক্রির টাকা থেকে দিয়েছি আমি। ও নিয়ে তুমি এমন করে ফোঁস-ফোঁস কোরো না গোখরো সাপের মত। এস ঠাকুরপো।

মহাতাপের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া সে ঘরে ঢুকিল। ঢুকিবার সময়ে শুকনা কাপড়টা তাহার কাঁধে ফেলিয়া দিল।

ঘরের মধ্যে কান-উঁচু থালায় প্রচুর পরিমাণে ভাত, একটা বড় বাটিতে জলের রঙের 'আমানি' অর্থাৎ পান্তাভাত-ভিজানো জল, একটা বাটিতে ডাল, পোস্ত-বাটা অনেকটা, গেলাসে জল। মোটা ভারী বেশ বড়সড় একখানা কাঠের পিঁড়ি পাতা। পাশে মানদা শিল-নোড়া লইয়া কুড়তি কলাই বাটিতে বসিয়াছে। ঘস-ঘস শব্দে দুলিয়া দুলিয়া বাটিয়া চলিয়াছে।

মহাতাপকে আনিয়া বড় বউ পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া দিল। নাও, বস।

মহাতাপ বসিয়া দেখিতে লাগিল, কি কি আছে?

বড় বউ বলিল, যা ভালবাস তাই আছে। খাও। পান্তা ভাত, আমানি, পোস্ত-বাটা, কলাইয়ের দাল, অম্বল—সব আছে। আর ওই কুড়তি কলাই তোমার সরস্বতী-ঠাকরুন বাটছে।

—কি? সরস্বতী ঠাকরুন কুড়ুৎ কলাই বাটছে? ওই বাঁটকুল—সরস্বতী ঠাকরুন?

—আমি লক্ষ্মী হলে, মানু সরস্বতী বই কি। আমার ছোট বোন তো!

—আচ্ছা! ঘাড় নাড়িতে লাগিল মহাতাপ সমঝদারের মত।

মহা— ঘাড় নাড়তে হবে না। খাও।

খাওয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল মহাতাপ।

ওদিকে সেতাব দাওয়ার উপর এক হাতে হুঁকা ও অন্য হাতে কল্কে ধরিয়া ফুঁ দিতেছিল। সে উঠানের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘরের দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে বিরক্তিভরে বলিতেছিল, হুঁ! লক্ষ্মী! সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। ঘরের লক্ষ্মী তাড়িয়ে দেবে। হুঁ! দশ টাকা! দশ টাকা সামান্য কথা! হুঁ!—বলিয়া হুঁকায় কল্কে বসাইয়া টানিতে টানিতে উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এবার সে দেখিতে পাইল, উঠানে বাপের চৌকিতে বসিয়া মানিক গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছে এবং মুখে জল লইয়া ফু-ফু করিতেছে।

সেতাব হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—এই, এই কি বিপদ! ও কি হচ্ছে, অ্যাঁ! সে উঠানে নামিয়া মানিকের দিকে অগ্রসর হইল।

মানিক বলিল, ছিব হব, ছিব। ফুঁ! বলিয়া জল ছিটাইয়া দিল।

—ছি-ছি-ছি! অ বড় বউ! শুনছ! মানকে কি করছে দেখ!

ছোট বউ বাহির হইয়া আসিল এবং মানিকের [illegible] গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আধ-ঘোমটায় চা[illegible] বলিল, দুষ্টু ছেলে কোথাকার!

—ছিব, ছিব—আমি ছিব।

—ছিব? তা হবে বইকি? তা না হলে আম[illegible] আগুন নিভে যাবে যে! শিব হবি? শিব হবি? ছে[illegible] বসাইয়া দিল। মানিক কাঁদিয়া উঠিল।

সেতাব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ছোট বউমা! মেরো না [illegible]

মানদা আরও একটা কিল বসাইয়া দিল।—হারামজ[illegible]

সেতাব আবার বলিল, ছোট বউমা! তুমি গ[illegible] তোমার একলার নয়। বড় বউ, বলি অ বড় বউ!

বড় বউ বাহির হইয়া আসিল।—মানু!

মানু উষ্মাভরেই বলিল, কি?

—ভাসুর বারণ করছে, তবু তুই মারছিস ?

—মারব না ? দেখ না কি করেছে ? আমার কাপড়টা কি

—কাপড় তো ছাড়লেই হবে। দে, আমাকে দে।

—না। আলুনো আদর দিয়ে একজনের মাথা খেয়েছ।
বলিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

—কি ? কি বললি ছুটকী ?

সেতাব পায়চারি করিতে করিতে হুঁকা টানিতেছিল।
ঘুরিয়া এবার সে বলিল, ছোট বউমা মিছে কথা বলে
মহাতাপের মাথা তুমিই খেয়েছ। ছোট বউমা ঠিক বলেছে।

বড় বউ জবাব দিবার আগেই মহাতাপ ডালভাত-ম
চাটিতে চাটিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, সরস্বতী! ওই
সরস্বতী—ও দুষ্ট সরস্বতী হ্যায়।

বড় বউ বলিল, সব খেয়েছ ? না, না খেয়ে ঝগড়া
কুঁদুলে ঠাকুর।

—চাট্ পোট্! চাট্ পোট্ করকে খা লিয়া।

—তা হলে হাত ধোও, ধুয়ে শুয়ে পড় গে। দেখি
মানুষ! বলিয়া আবার ঘরে ঢুকিল। মহাতাপ জলের ঘটি তু
ধুইতে লাগিল।

সেতাব বলিল, গাজনে দশ টাকা চাঁদাই শুধু দিস নি,
ধান পাওনা ছেড়ে দিয়েছিস ?

মহাতাপ তাহার মুখের দিকে চাহিল—হাঁ হাঁ। কাগজে লিখে দিয়েছি।
ধান সর্ব ছাড়িয়া দিলাম—শ্রীমহাতাপ মণ্ডল। দিয়েছি। ঘোঁতনার বাড়ি
তে লাগল। বললে—বাবা, ঘোঁতনা তো জামা-জুতো
যাত্রা করে, চাষ করে না। ভাগিদার চাষ করে যা দেয়
না। দেনা শোধ কি করে দেব ? ঘোঁতনার বাচ্চা-
দশা। তাই ছোড় দিয়া। হ্যাঁ ছোড় দিয়া। লিখ
কাগজমে ঘস-ঘস করকে লিখ দিয়া হ্যায়!

...যেছিস ?

...। ...একদম লিখ দিয়া হ্যায়। .

... নিজেদের কি হবে ?

... কোলে লইয়া মানদা বাহির হইয়া আসিল। সে বলিল, ওই ... মতন টিকটিকির দশা হবে। বলিয়া বড় বউ যে ঘরে ... সেই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

...লিয়া উঠিল।—দেব তোর পিঠে কিল ধমাধম লাগিয়ে। ... ছেলে টিকটিকির মত হবে? মহাতাপ নিজে হাতে চাষ ...য়। মহাতাপ ভীম হ্যায়। ঘোঁতনাকে যে ধান ছেড়ে ... আমি এবার বাড়তি ফিরিয়ে দেব। দন্তভরে সে নিজের ...পড মারিল।

...বউ বাহির হইয়া আসিল। তাই হবে, তাই ফলাবে। যাও, ...। চার রাত্তির বোধ হয় ঘুম হয় নাই। যাও। যাও ...ও বলছি।

... আমি যাচ্ছি।

...র মধ্যে ঢুকিতে উদ্যত হইল।

...া, লক্ষ্মী আর এ বাড়িতে থাকবে না। মোড়লবাড়ির লক্ষ্মীকে ...করলে সবাই মিলে। সেকালের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি ...নে হায়! হায়রে হায়!

...ও ... নামাইয়া রাখিয়া সেতার চলিয়া গেল। বলিতে বলিতেই গেল—হায়রে হা... হায়রে হায়!

মহাতাপ হুঁকা ...কেটা তুলিয়া লইয়া দাদাকে ভ্যাঙচাইয়া দিল—হায়রে হায়! হায়রে হায়! ওই এক আচ্ছা বুলি শিখেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাতাপ কথাটা মিথ্যা বলে নাই ; ওই 'হায় রে হায়' কথাটা সেতাবের মুখে লাগিয়াই আছে। উঠিতে বসিতে সে বলে—সেদিনের কথা এর মধ্যে ভুলে গেলি সব! হায় রে হায়। হায় রে হায়। অর্থাৎ কথাটা সকলেই ভুলিয়াছে কেবল সেতাব ভুলিয়া যায় নাই। কথাটার মধ্যে সেতাবের জীবনের পরম অহঙ্কার নিহিত আছে। বেশী দিনের কথা নয়, সেতাবের বাপ প্রতাপ মণ্ডল হঠাৎ মারা গেল, সেতাবের বয়স তখন বারো, মহাতাপের বয়স ছয়। মাঝের একটি ভাই তাহাদের নাই। প্রতাপের মৃত্যুর মাস কয়েক না যাইতেই মহাজন পরপর তিনটা নালিশ করিয়া প্রতাপের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বসিল।

প্রতাপ মণ্ডল হাঁকডাকের মানুষ ছিল। নামেও প্রতাপ কাজেও [illegible] ছিল। গ্রামের মাতব্বর, জমিদারের মণ্ডল, ইউনিয়ন [illegible] অনেক কিছু ছিল। গ্রামের কাছেই আধা শহর লক্ষ্মীপুরে [illegible] একটা বাবুলোকেদের কাছেও খাতির ছিল। মনটা ছিল উদা[illegible] পাঠকের দুর্দান্ত। বাড়িতে চাষের ধূম ছিল। লক্ষ্মীপুরের বাবুরাও [illegible] তাহার কাছে ধান 'বাড়ি' অর্থাৎ ধার লইত। হঠা[ৎ] প্রতাপ [illegible] নামিয়া বসিল। নামিল নামিল এমন ব্যবসায়ে [illegible] যাহার সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি জগাই পাঠককে শূন্য বখরাদার করিয়া ঠিকাদারির কাজে নামিয়া পড়িল।

সালটা তখন ১৯২৬-২৭ সাল। সবে দেশে ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে প্রতাপ মণ্ডলদের বোর্ডে হঠাৎ বছরের শেষাশেষি খবর আসিল—সরকার স্থানীয় জল সরবরাহের জন্য ইন্দারা করিতে টাকা দিবেন ; শর্ত ইউনিয়ন বোর্ডকে এক-চতুর্থাংশ টাকা দিতে হইবে। এক-একটা ইন্দারায় প্রায় পাঁচশো করিয়া টাকা খরচ, অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ডকে একশো পঁচিশ আন্দাজ

হইবে। প্রতাপ নিজের গ্রামে ইন্দারার জন্য চাঁদা তুলিতে চেষ্টা করিল ... পায়ে অনেক ধূলা মাখিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া পঁচিশ টাকা কয়েক আনার চাঁদা তুলিতে পারিল না। এই সময় জগাই পাঠক তাহাকে পরামর্শ ...—মোড়ল এক কাজ কর। ইন্দারাটা তুমি ঠিকে নিয়ে নাও। ঠিকেদারির একটা লাভ আছে তো, সেই লাভে ও টাকা উঠে যাবে। আমি দেখে-শুনে সব ঠিক করে দোব।

ভয়ে ভয়েই প্রতাপ কাজে নামিল। কিন্তু ইন্দারাটা শেষ হইতেই ভয় কাটিয়া উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। ঠিকা অর্থাৎ কন্‌ট্রাক্ট হইতে যাহা লাভ হইয়াছে তাহা দেয় সিকি টাকার বেশ কিছু উপরে উঠিয়া গিয়াছে। লোকাল কন্ট্রিবিউশান অর্থাৎ স্থানীয় চাঁদার দাবি ছিল সিকি অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ, সেই স্থানে লাভ দাঁড়াইল শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা। বিল আদায় করিয়া নগদ পঞ্চাশ টাকা প্রতাপের হাতে তুলিয়া দিয়া সেক্রেটারি পাঠক বলিল--দশ টাকা পুজো দিয়ো মোড়ল, পনেরো টাকা আমার, পঁচিশ টাকা তোমার।

প্রতাপের চোখ দুটো জ্বলিয়া উঠিল।

...ক বলিল, ইন্দারার কাজে তবু লাভ কম। রাস্তার ঠিকে কি ...কে যদি হত না—তবে দেখতে অর্ধেক খরচ অর্ধেক লাভ। ...কা। করবে ঠিকের কাজ? ইউনিয়ন বোর্ড নয়, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ঠিকে নেবে...

প্রতাপ কথা বলিতে পারিল না, সেক্রেটারি পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাঠক চতুর লোক, তাহার উপমা দিয়া লোকে বলে--মৃগেল মাছ। পাঁক কাটিয়া চলে আবার সমানে ভাসিয়া সাঁতারও কাটে। প্রতাপের দৃষ্টির অর্থ তাহার বুঝিতে দেরি হইল না। পুকুরের জলের মধ্যে ভাসমান টোপের সম্মুখে মাছ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাসিয়া পাঠক বলিল—রাস্তার কাজ পাথর কুড়িয়ে জমা করা আর কাঁকর কেটে তোলা, তারপর গরুর গাড়িতে বয়ে ফেলা। আলমপুরের বাবুদের জমিদারিটাই রাস্তার কাজের পয়সায়। কাঁচা পয়সা হে। তারপর দশ টাকা ওভারসিয়ারের পকেটে গুঁজে দিলে মাপ বাড়িয়ে বিশ টাকা পাইয়ে দেবে তোমাকে

লেগে যাও। আমি বরং সব দেখে-শুনে দেব তোমার। আমাকে দিয়ে. কিছু। শুধু বখরাদার করে নিয়ো।

কথাগুলার একটাও মিথ্যা বলে নাই পাঠক। আলমপুরের বিখ্যাত জমিদারবাড়ির অভ্যুদয় এই রাস্তার কাজের কণ্ট্রাক্টারি হইতেই। প্রায় একশো বছর আগে দুইটা জেলার বড় বড় রাস্তাগুলো তৈয়ারী ও মেরামতের কাজ ছিল তাঁহাদের একচেটিয়া। এই ঠিকাদারির লাভ হইতেই আলমপুরের চৌধুরীবা তিরিশ হাজাব টাকা আয়ের জমিদারি কিনিয়া পেশা চাষের পরিবর্তে দলিল-দস্তাবেজে পেশা জমিদারি লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। আর ওভারসিয়ারের পকেটে খামে পুরিয়া টাকা দেওয়ার গল্প না জানে কে? বাইসিক্ল চড়িয়া 'হেটকোট' পরিয়া ওভাবসিয়ার বাবুদের সে দেখিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হইয়া তাহাদেব সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। স্থতরাং—।

সুতবাং সে নামিয়া পড়িল। এবং নামিয়াই উধ্বর্শ্বাসে ছুটিতে শুরু করিল। প্রথম বছরে লাভ হইল এক হাজার টাকার কিছু বেশী। প্রতাপ মূলধন লইয়াছিল তিন হাজারের কিছু কম। তিন হাজারে একহাজার লাভ। দ্বিতীয় বৎসরে মূলধন বাড়াইয়া সে আট হাজারে তুলিল; একটা ঘোড়া কিনিল, খান তিনেক সেকেণ্ড হাণ্ড বাইসিক্ল কিনিল এবং পাঠকের এক শালা ও এক ভাইপোকে কাজ দেখিবার জন্য মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত করিল। চার পাঁচজন সাঁওতাল সর্দার অর্থাৎ গ্যাঙ সর্দার, তিনজন গরুর গাড়ির সর্দার, একজন রাজমজুরদের সর্দার নিযুক্ত করিয়া শোরগোল করিয়া কাজ জুড়িয়া দিল। নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। পাঠক ঘুরিত একখানা নতুন বাইসিক্লে। প্রথম বছর তিনেক নিজের বাড়িতেই ছিল সকল কাজের কর্মকেন্দ্র, বাইরের চাষের ঘরটাতেই চুন, সিমেণ্ট, গাইতি, কোদাল, খাতাপত্র থাকিত; চতুর্থ বৎসরে নবগ্রামে ঘর ভাড়া করিয়া আপিস বসাইয়া দিল। খাতায় পত্রে বাহিরে কাজ চলিতে লাগিল। পাঠক সদর শহরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আপিসে বিল হিসাব ইত্যাদি লইয়া মাসে পনেরো দিনের বেশী থাকিতে হয় বলিয়া সেখানে একটা ঘর ভাড়া লইল।

প্রতাপ মোড়ল মোড়ল উপাধি ছাড়িয়া ঘোষ উপাধি কায়েম করিল। গ্রামের জ্ঞাতি-কুটুম্বদের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়াও পর হইয়া দাঁড়াইল। পোশাকে পরিচ্ছদে কথায় বার্তায় সে হইয়া গেল আর এক মানুষ। দলিল-দস্তাবেজে সে 'পেশা চাষের' বদলে 'পেশা ব্যবসায়' লিখিতে আরম্ভ করিল। বাড়িতে প্রতাপের স্ত্রী শঙ্কিত হইল। প্রতাপ তাহাকে প্রায়ই বলিত একটু সভ্য হও। চাষীর পরিবার যখন ছিলে তখন যা করেছ যা পরেছ যা বলেছ সেজেছে। এখন ভদ্রলোকের চালচলন শিখতে হবে। ও গোবর দেওয়া, কাপড় সেদ্ধ করা এসব ছাড। মধ্যে মধ্যে বলিত, 'এখানকার ঘরবাড়ি যা আছে থাক, নবগ্রামে গিয়ে নতুন বাড়ি করব।' অন্যদিকে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যপদের উপর বক্রব্যঙ্গ দৃষ্টি হানিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য হইবার আয়োজন করিল। এমন সময়ই হঠাৎ একদা সে কোথা হইতে টাইফয়েড ধরাইয়া আনিয়া বিছানায় শুইল। এবং চব্বিশ দিনের দিন মারা গেল। প্রতাপের স্ত্রী জগাই পাঠককে ডাকিয়া বলিল—পাঠক মশাই, কি হবে?

পাঠক বলিল—তাই তো! আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে গিয়েছি বাপু। হাজার দুয়েক টাকা না হলে তো সব অচল।

প্রতাপের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল।

পাঠক যাহা বলিল তাহা এই। একটা বড় সাঁকোর ঠিকা ছিল, সাঁকোও হইয়াছে কিন্তু সেটা ফাটিয়া গিয়াছে। রাস্তার ঠিকায় কাঁকড় পাথর যাহা মজুত করা হইয়াছে নতুন ওভারসিয়ার তাহার মাপ ঠিক দেয় নাই। প্রায় ছয় আনা পরিমাণ কাটিয়া দিয়াছে। বিল সমস্ত আটক পড়িয়াছে। এদিকে গাড়োয়ান, কুলি, রাজমিস্ত্রীদের তিন সপ্তাহের মজুরি বাকি। তহবিল শূন্য।—"এখন অন্তত হাজার টাকা চাই। এ সময় বিপদের সময়। টাকার কথা মুখে আসে না। কিন্তু না বললেও নয়। গাড়োয়ান কুলি রাজমিস্ত্রীদের কথা শুনে আমার হাতপা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গিয়েছে। তারা বলাবলি করছে আমাকে ধরে মারবে আর—।"

বার দুই ঢোক গিলিয়া বলিল—"আর বলছে দ
তোমাদের চেপে বসবে। না খেয়ে তো তারা খাটতে প

প্রতাপ জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছাড়িয়াছিল, গ্রামের লোকও সরিয়া ... প্রতাপের মৃত্যুর পর তাহারা প্রকাশ্যে শত্রুতা না করিলেও সাহায্য ... ছিল। এক পা আগাইয়া আসিল না। নিজেদের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া অধিকাংশ লোকই বলিল—এ হবে তা তো জানা কথা।

* * * * *

সেসব দিনের কথা সেতাবের মনে আছে। বাপ প্রতাপ মণ্ডলের ঠিকাদারির জমজমাট আমলে সেও বাপের মত নিজেকে এ গ্রামের সকল ছেলে হইতে পৃথক বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছিল। আর মহাতাপ একেবারে প্রায় আদুরে গোপাল বনিয়া গিয়াছিল। ছেলেবেলা হইতেই মহাতাপ সবল চঞ্চল। বাপের অবস্থার আকস্মিক উন্নতিতে সে আদর পাইয়া হইয়া উঠিয়াছিল দুর্দান্ত।

সবই মনে আছে সেতাবের।

ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি পাঠক সেদিন যে বলিয়া গেল গাড়িওয়ালারা ও মজুরেরা দল বাঁধিয়া পাওনার জন্য আসিবে এবং গোলা ভাঙিয়া ধান বিক্রি করিয়া টাকা উশুল করিয়া লইবে সে কথা সে মিথ্যা বলে নাই। একদিন সত্যই তাহারা আসিল। সঙ্গে আসিল প্রতাপের জ্ঞাতি ভাই ধানের পাইকার গোপাল ঘোষ, ওই ঘোতন ঘোষের বাপ। সেতাপ মহাতাপের মা তখন বউ মানুষ, বয়সও অল্প, তিরিশও হয় নাই, সেদিন সে ঘোমটা খুলিয়া গিয়া দাঁড়াইল মোটা মোড়লের বাড়িতে। মোটা মোড়ল ধর্মভীরু মানুষ এবং ভাল মানুষ। প্রতাপের সঙ্গে ইদানীং তাহার কথাবার্তা বড় একটা ছিল না। মোটা মোড়ল গ্রাম সম্পর্কে দাদা বলিয়া কয়েকবার প্রতাপকে সৎপরামর্শ দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রতাপ সে কথার উত্তরে বলিয়াছিল—আমরা উন্নতিতে বুক সবার টাটিয়ে গেল তা আমি জানি।

... । মোটা মোড়ল এ উত্তরে আঘাত পাইয়াছিল, ...য়া প্রতাপের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল এবং ... মাড়ায় নাই। পথে ঘাটে প্রতাপের সঙ্গে দেখা

প্রতাপ [illegible]ইয়া মরিয়া যাইত। কিন্তু প্রতাপের বিধবা বধূ সেদিন গিয়া গ্রামের [illegible]ত্র সে বলিল—সে কি! চল মা চল! দেখি।
পো[illegible]ণ আসিয়া খাতা দেখিয়া ধান বিক্রি করিয়া সকলের পাওনা শোধ করিয়া দিল। পাঠককে বলিল—হিসাবের খাতাটা যে একবার বার করতে হবে পাঠক মশাই!

পাঠক আকাশ হইতে পড়িল—খাতা তো মোড়লের বাড়িতে। খাতাপত্র তো আমি জানি না। মোটা মোড়ল অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঠককে কায়দা করিতে পারিল না। গোটা গ্রামের লোক প্রতাপের ছেলে-দের বিরুদ্ধেই একরকম দাঁড়াইয়াছিল। মোটা মোড়ল একা কোন রকমেই তাহাদের বুঝাইতে পারিল না। দোষী প্রতাপ মরিয়া গিয়াছে, তাহার ছেলেরা নির্দোষ নিরপরাধ একথা তাহারা কোন রকমেই বুঝিল না। ওদিকে হঠাৎ মহাজন নালিশ করিয়া বসিল—সে টাকা পাইবে। তিন হাজার টাকা।

তিন হাজার টাকা? প্রতাপ মোড়ল টাকা ধার করিয়াছে?

পাঠক বলিল—করিয়াছে। হ্যাণ্ডনোটের বয়ান সে লিখিয়াছে এবং প্রতাপ সই করিয়াছে। ব্যবসায়ের জন্য টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল। সকল ব্যবসায়ীকেই ধার করিতে হয়। ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া মিথ্যা বলিতে পাঠক পারিবে না। আসল কথা কিন্তু অন্য। দরখাস্ত ইত্যাদির জন্য প্রতাপ কিছু সাদা কাগজে সই করিয়া পাঠককে দিয়াছিল। পাঠক মহাজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সেই কাগজে হ্যাণ্ডনোট বানাইয়াছে।

এদিকে ছোটছেলে মহাতাপ পড়িল জ্বরে। জ্বর দাঁড়াইল টাইফয়েডে। প্রতাপের টাইফয়েডের বিষ তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল। যমে মানুষে টানাটানি করিয়া মহাতাপ বাঁচিল কিন্তু কেমন বোকা বুদ্ধিহীন হইয়া গেল। প্রথম প্রথম কথার জড়তা হইয়াছিল। কথা বলিলে বুঝিতে পারিত না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত।

সেতাবের মনে পড়ে সেতাবও সারা পৃথিবীর দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিত। সে নেহাত ছোট ছিল না। বুঝিবার বয়স তাহার হইয়াছিল। বাপ বাঁচিয়া থাকিতে শুনিত—পাঠক বলিত, আরও দু-চারজন

বলিত, মোড়ল ছেলেকে তুমি ভাল ম্যারি
পড়াবে। ওভারসিয়ার হলে এ ব্যবসা একে ।

কথাটা কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িল নবগ্রামে ও পৌঁছিয়াছিল। সেখানে ঘোঁতন ছিল তাহার সহপাঠী। ঘোঁত পড়াশুনাতে ভাল ছিল এবং নবগ্রামের আধাশহুরে ফ্যাশান ও কথাবার্তাতেও পাকা ছিল। সে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া ওপোর স্যার বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়া তাহাতে সেতাব লজ্জা অনুভব করিত বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও অহঙ্কার অনুভব করিত। হঠাৎ বাপ মরিতেই ঘোঁতনের ওই ঠাট্টা মারাত্মক রূপে অসহনীয় হইয়া উঠিল। অন্যদিকে গ্রামে পথে ঘাটে লোকজন তাহাকে দেখিয়া বলিতে শুরু করিল—ছেলেটা তো বড় হয়েছে, আবার পড়া কেন রে বাপু? এই অবস্থায়। যা হোক কুলকর্মে লাগলে দুমুঠো খেতে পাবে তো! পড়েই বা করবে কি? হু!

ওদিকে মহাজন নালিশ করিয়া ডিগ্রী করিল। প্রায় বিঘা দশেক জমি বিক্রি হইয়া গেল। বৎসরের শেষে কৃষাণ মজুরেরা অবশিষ্ট জমির ধান তুলিয়া ভাগ করিয়া যে ধান লইয়া মণ্ডলবাড়ির উঠানে মরাই বাঁধিল তাহাতে বাড়ির উঠানের একটা কোণও ভাল করিয়া ভরিল না। অথচ আগে উঠানটার অর্ধেকটা মরাইয়ে মরাইয়ে ভরিয়া থাকিত। সেতাব মহাতাপের লুকোচুরি খেলার আদর্শ ক্ষেত্র হইয়া উঠিত।

সেতাবের মা মরাইয়ের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল গড়াইয়া আসিল। আর বছর দুয়ের মধ্যে আরও দুঃসময় আসিল। সেদিনও সেতাবের মা কাঁদিতেছিল; সেতাব সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। পরীক্ষায় সেও একটা বিষয়ে ফেল করিয়াছে। প্রথম ডাকে প্রমোশন পায় নাই; দ্বিতীয় ডাকে পাইবে কি না তাহারও কোন স্থিরতা নাই। তাই চুপচাপ বসিয়া ছিল, কথাটা মাকেও বলে নাই। হঠাৎ মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বার দুই পাক মারিয়া বলিল—আমি আর পড়ব না।

—পড়বি না? মা অবাক হইয়া ছেলের মুখের দিকে তাকাইল।

রেছিস—এবার ভাল করে পড়। আসছে

না।

আমার মুণ্ডু?

ষবাস করব। নইলে যা আছে তাও থাকবে না। ধার করে

হবে। তার দায়ে জমি বিকিয়ে যাবে।

সতাব পড়া ছাড়িয়া সেই সংসারের হাল ধরিল। দেহ তাহার দুর্বল ছিল, নিজে হালের মুঠা ধরিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারিল না কিন্তু দিনরাত্রি তদারকের ফলে চাষের উন্নতি হইল। অনাবৃষ্টির সময় গভীর রাত্রে সে মাঠে বাহির হইয়া লোকের জমির আল কাটিয়া নিজের জমি ভিজাইয়া লইত। চাষের আগে রাত্রে মাঠে গিয়া দশখানা জমি হইতে দশঝুড়ি সার উঠাইয়া নিজের জমিতে ছড়াইয়া দিয়া আসিত। পথে চলিতে চলিতে গোবর পাইলে গোবরটুকু উঠাইয়া লইয়া হয় জমিতে নয় নিজের সারগাড়িতে আনিয়া জমা করিত। বৎসর দুয়েক পর সে মাথা খাটাইয়া এক ব্যবসা বাহির করিল। তরির ব্যবসা ও তাহার সঙ্গে বীজের ব্যবসা। নদীর ধারে তাহাদের খানিকটা গোচর—অর্থাৎ গোচারণভূমি ছিল। সারা বর্ষাটা নদীর বানের জলে ডুবিয়া থাকিত। বান কমিয়া গেলে প্রচুর ঘাস হইত, বর্ষার তিন মাস ছাড়া বাকি নয় মাস গোরুগুলি সেখানে ঘাস খাইত। সেইখানে সে তরির চাষ শুরু করিল। এবং বাজারে প্রথম মরশুমে তরি তুলিয়া বিক্রয় করিত। তাহার আলু উঠিত কার্তিক মাসে; তখনকার দিনে আট আনা ছয় আনা সের বেচিত। টমাটো, বেগুন, মূলা তাহার প্রথম ঝোঁকে উঠিত। সেই ফসল লইয়া সে নিজে গিয়া হাটে বেচিয়া আসিত। আবার, একদফা এইসব ফসল লাগাইত একবারে শেষ ঋতুতে। অর্থাৎ আলু তুলিত চৈত্র মাসে। সেই আলু পাকাইয়া বালির উপর বিছাইয়া রাখিত, বিক্রি করিত বর্ষার সময়, কতক বিক্রি করিত বীজ হিসাবে। মূলা-বেগুনও তাই। শেষ মরশুমে পাকাইয়া বীজ করিয়া ঘরে তুলিত এবং

পরবর্তী ফসলের মরসুমে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরিয়া সেই বীজ চাষীদের সরবরাহ করিয়া আসিত। টাকা আদায় করিত ফসল উঠিবার পর। বীজে ফসল না জন্মিলে তাহার দাম লইত না। ইহাতেই তাহার দশাটা সে কিছু ফিরাইয়া ফেলিল। শুধু ইহাতেই নয়, বাড়ির হালচালও সে বদলাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রতাপ মণ্ডল ব্যবসা ফাঁদিয়া ঘরে চুনকাম করাইয়াছিল, সে সেই চুনকাম-করা দেওয়ালের চুন ঢাকিয়া মাটি দিয়া নিকাইয়া দিল। খানকয়েক চেয়ার কিনিয়াছিল প্রতাপ মণ্ডল। সেগুলা বিক্রি করিয়া দিল। খান দুই বেঞ্চ ছিল, সেগুলার উপরে বীজের হাঁড়ি বসাইল। বাড়ির খাওয়াদাওয়া পোশাক-আশাক সব বদলাইয়া দিল। তাহার মা তাহাতে আপত্তি করিল না। আপত্তি করিল মহাতাপ। খাওয়াদাওয়া ভাল না হইলে তাহার চলে না। সে আঁ-আঁ করিয়া চীৎকার করিত। দুই-তিন বৎসরে তাহার কথার জড়তা কাটিয়াছে, শরীরও সারিয়াছে, সেই পূর্বের সবল দেহ হইয়াছে কিন্তু মাথার গোলমালটা যায় নাই। মধ্যে মধ্যে সে সেতাবকে লাঠি লইয়া তাড়াও করিত।

সেতাব হাসিত। ভাগ্য তাহার ফিরিয়াছে, ভাইয়ের আবদারে রাগ করিতে মন উঠিত না।

ঠিক এই সময়েই একদিন দশ বছরের চাঁপাডাঙার বউ চেলির কাপড় পরিয়া, হাতে রুপার গাড়ু, গলায় মুড়কিমালা দোলাইয়া, দুই পায়ে চারগাছা রুপার মল বাজাইয়া মণ্ডলবাড়িতে আসিয়া ঢুকিল।

সেও এক বিচিত্র ঘটনা। লোকে বলিল, একেই বলে বিধির বিধান। যে যার হাড়িতে চাল দিয়াছে। নইলে ও মেয়ের বিয়ে হবার কথা কার সঙ্গে—হল কার সঙ্গে!

কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়েটির বিবাহের সম্বন্ধ ছেলেবেলা হইতেই ঠিক ছিল গোপাল ঘোষের ছেলে ঘোঁতনের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল!

চাঁপাডাঙার বউ কাদম্বিনীর বাপ উমেশ পাল চাঁপাডাঙার সম্ভ্রান্ত চাষী। সম্ভ্রান্ত মানে আধুনিক কালের শিক্ষায় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নয়, খাঁটি এদেশের

; গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, কাঁধে চাদর, পায়ে চটি তার পোশাক, বিনীত মিষ্ট কথা, অথল অকপট মানুষ, দিনে চাষ করে, নিজে হাতে লাঙল বয়, গো-সেবা করে, সন্ধ্যায় মোটা গলায় হরিনাম করে; ইংরিজী-জানা বাবুদের খাতির করে ভয় করে, কিন্তু বিশ্বাস করে না, ঘৃণাও করে না। তবে তাহারা যখন তাহার বাড়িতে বর্ষার সময় ধানের অভাব পড়িলে ধার করিতে আসে তাহাদের মনে মনে অনুকম্পা করে। মুখে প্রকাশ করে না। ধান সে দেয়। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ধান পাইবে না জানিয়াও দেয়। মুখে তখন সে বার বার বলে, হরিবোল—হরিবোল!

এই উমেশ পালের স্ত্রী এবং গোপাল ঘোষের স্ত্রী অর্থাৎ ঘোঁতনের মা, এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যসখী সই। গোপালের ছেলে ঘোতন ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে উমেশের স্ত্রী বলিয়াছিল—আমার মেয়ে হলে তোমার ছেলেকে আমি জামাই করব। উমেশের প্রথম দুই সন্তান পুত্র, তৃতীয় সন্তান কন্যা কাদম্বিনী। কাদম্বিনী ভূমিষ্ঠ হইলে উমেশের স্ত্রী সইকে খবর পাঠাইয়াছিল যে···মেয়ে হইয়াছে। কথা যেন পাকা থাকে।

উমেশ পাল খুঁতখুত করিয়াছিল। কারণ গোপাল ঘোষ পাইকার অর্থাৎ দালাল মানুষ। ধানের দালালি করে। চাষবাস আছে কিন্তু ধানের দালালিতেই ঝোঁক বেশি। সেই সূত্রে আধাশহুরে মানুষ। সদ্‌গোপ হইয়াও চাষ করে না, করে ধানের পাইকারি—অর্থাৎ ধান-চালের দালালি। দালালিতে কাজের চেয়ে কথা বেশী। কাজের চেয়ে যেখানে কথা বেশী সেখানে কথার সবই ভুয়া অর্থাৎ মিথ্যা। তবুও স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করে নাই। বাক্‌ই যখন দিয়াছে মেয়ের মা তখন না মানিলে উপায় কি? মেয়ের জন্মের পর কিছুদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দুই বাড়িতে খবরাখবরের আদানপ্রদান চলিল। তত্ত্ব-তল্লাসও চলিল। তারপর ধীরে ধীরে সব কমিয়া আসিল। তারপর কাদুর বয়স হইল এগারো। ওদিকে বাজারে গুজব রটিল—নূতন আইন হইতেছে যে, মেয়ে যুবতী হওয়ার আগে বিবাহ দিলে জেল হইবে। বিবাহ নাকি হইবে। কেহ বলিল চৌদ্দ বছর, কেহ বলিল ষোলো, কেহ বলিল আঠারো

বছর বয়স না হইলে মেয়েদের বিবাহ চলিবে না। ভীষণ আ... কাঁধে আইন না কি আইন!

ওদিকে গোপাল ঘোষের ছেলে ঘোঁতন না কি ম্যাট্রিক দিয়াছে। বিবাহের বাজারে ছেলের দর খুব। গোপাল ঘোষ নাই, মরিয়াছে; উমেশ লোক পাঠাইল ঘোঁতনের মায়ের কাছে, অর্থাৎ স্ত্রীর সইয়ের কাছে। বিবাহ এক মাসের মধ্যেই শেষ করিতে অনুরোধ জানাইল। উত্তর দিল ঘোঁতন। সে বলিয়া পাঠাইল—বিবাহ করিতে সে এখন আদৌ ইচ্ছুক নয় এবং পরবর্তীকালেও সে যখন বিবাহ করিবে তখন লেখাপড়া-জানা মেয়ে বিবাহ করিবে। এগারো বৎসর বয়সের মেয়েকেও সে বিবাহ করিবে না। ঘোঁতনের মা লোকের সামনে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—আমার দশা দেখে যাও বাবা। সইকে বলো, সয়াকে বলো, আমি নিরুপায়। দিনরাত চোখের জল সার হয়েছে আমার। আমার কোন হাত নাই।

জবাব পাইয়া উমেশ পাল খানিকক্ষণ গুম হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করিল সেতাব। তাহার সঙ্গে একজন ভারী। তাহার কাঁধের ভারের দুই দিকে বীজের বস্তা। উমেশ পালের মুখটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, পাত্র সে পাইয়াছে। ঠিক হইয়াছে। সেদিন গনৎকার কাদুর হাত দেখিয়া বলিয়াছিল—এ মেয়ের পাত্র পায়ে হেঁটে তোমার বাড়ি এসে উঠবে পাল। তুমি দেখে নিয়ো।

কথাটা শুনিয়া উমেশ পালও হাসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—ভারি চতুর এই গনৎকার মশায়েরা। ঘোঁতনের সঙ্গে কাদুর বিবাহের সম্বন্ধের কথা এখানে মোটামুটি সবাই জানে। সেই কথাটি সে তাকমাফিক চমৎকার ঝাড়িয়া দিয়াছে। আজ কিন্তু সে সেই কালো বামুনকে মনে মনে প্রণাম করিল। প্রতাপ মণ্ডল এ অঞ্চলের নামী মানুষ ছিল। তাহার ছেলে সেতাব। ...শ উচ্চ। ছেলের যোগ্যতা ছেলে নিজে প্রমাণ করিয়াছে। যে ছেলে ডুবন্ত নৌকাকে ভাসাইয়া তুলিতে পারে, সে নাই হইল ম্যাট্রিক পাশ।

পরের দিনই সেতাবের বাড়ি আসিয়া তাহার মায়ের কাছে কথা পাড়িল। এবং এক মাসের মধ্যেই বিবাহ শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সেতাবের মা বউ দেখিয়া খুশী হইল। মহাতাপ বউয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বলিল—এঃ—এই আবার বউ হয়? এইটুকুন মেয়ে।

মা বলিয়াছিলেন--হয়। ওই বউ বড় হবে। তোমার বড় ভাজ--তোমার মায়ের তুল্য হবে। আমার ঘরের লক্ষ্মী।

সেতাব তাহার পর ধূলার মুঠা ধরিয়াছে, সোনার মুঠায় পরিণত হইয়াছে সে ধূলা। আবার সোনার স্বপ্ন চোখের উপর ধূলায় পরিণত হইতে বসিয়াছে। সাধে সে হায় হায় করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কয়েক পরের কথা।

ভোরবেলা। সূর্য উঠি-উঠি করিতেছে। গোয়াল-বাড়িতে বলদ জোড়াটার কাঁধে হাল চাপাইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে মহাতাপ গান ধরিয়া দিয়াছিল।

মালসাট্ মারিয়া কাপড় পরিয়াছে। মাথায় রঙীন গামছা বাঁধিয়াছে। পাশে ওধারে লাঙল নামানো। একটা ধানের বীজের ঝুড়ি। দুইখানা কোদাল। হুঁকা-কল্কে। একটা ছোট চটের থলে।

কৃষাণ নোটন সাহায্য করিতেছে।

হাল জোতা হইলে মহাতাপ বার দুই সস্নেহে গোরু দুইটার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল। তারপর একটা ছোট ছোট টুকরিতে কিছু খইল লইয়া একটার মুখের কাছে ধরিল। গান চলিয়াছে। একটার মুখের কাছে খইল ধরিতেই অপরটা গন্ধে চঞ্চল হইয়া উঠিল স্বাভাবিকভাবে। মহাতাপ সোমের মাথায় ধমক দিল তাহাকে—ধ্যাৎ তেরি!

ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর হইতে বধূ .ইয়া কাঁধে গামছা ফেলিয়া স্নানে বাহির হইল।

বড়—চাঁপাডাঙার বউ যাইতে যাইতে দাঁ. হাসিয়া বলিল, ঘরদোর চাষবাস বলে তা হলে মনে পড়ল ছোট মোড়লের এতদিনে? চারদিন গাজন-নাচন নেচে—পাঁচ দিন ঘুম।

মানদা বলিল, ক ঘটি ভাঙ খেয়েছিল শুধাও।

মহাতাপ বলিল, ফের ব্যাড়ব্যাড় করে! এ কদিন কেবল ওই কথ, ব্যাড় ব্যাড়—ব্যাড়র ব্যাড়র—ক ঘটি ভাঙ খেয়েছ? ভাঙ কেউ হিসেব করে খায় নাকি?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, তা খায় না, কিন্তু ছেলেবেলায় অসুখ করে যার মাথা দুর্বল, সে ভাঙ খায় কেন? কথাটা মনে থাকে না কেন?

মহাতাপ বলিল, এই কান মলছি। বুয়েচ কি না! সত্যই সে কান মলিয়া বসিল—ওই ঘোতনা শূয়ার, আর ওই বোঁচা শেয়াল, ওই ওরাই—ওরাই যত অনিষ্টের মূল।

কথার উপরে কথা কহিয়া মানদা বলিল, ওরাই যত অনিষ্টের মূল। কচি খোকা! ওরা ঝিনুকে করে খাইয়ে দিয়েছিল!

—দেখ বউদিদি, দেখ। তুমি দেখ! তুমি বল ওকে—এমন করে কেন? কেমন করে দেখ! দোব আষিড়ে কিল পিঠে বসিয়ে, হ্যাঁক লেগে যাবে।

বলিয়া আগাইয়া গিয়া লাঙলটা কাঁধে তুলিয়া লইল।—চল্ রে চল্। নোটন?

নোটন ইতিমধ্যে তামাক সাজিতে গোয়ালের ভিতরে ঢুকিয়াছিল। তাহাকে না পাইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, নোটনা! বলি অ—বুড়ো হনু!

বড় বউ বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, মানুর ওপর রাগ করে পালিয়ে গেলে হবে না। আমার একটা কথার জবাব দাও তো। ঘোঁতনাকে ধানটা ছেড়ে দিয়ে এলে, ঘোঁতনার মায়ের কথায় দয়া হল, তা বুঝলাম। কিন্তু একবার জিজ্ঞাসাও তো করে! দাদা রয়েছে। কি, কথা বল না যে?

তোমার স্বামীর নিন্দে করতে হবে।

। আবার কার!

...সিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ।

...কে নাকে ঘড়াত শব্দ করিয়া গোরু দুটার পিঠে হাত দিয়া ...লাইয়া দিল।

...ড়ির বাহিরের দাওয়ায়—রাস্তার সামনে—সেতাব বসিয়া ঢেঁড়া ঘুরাইয়া শনের দড়ি পাকাইতেছিল। তাহার সামনে রাস্তার উপর দিয়া মহাতাপ হালগোরু লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। দাওয়ার উপর মানিক একটা মাটির পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে। রাখালটা কল্কেতে তামাক সাজিয়া ফুঁ দিতেছে। একটা খুঁটিতে একটা ছাগল বাঁধা. পাতা খাইতেছে। বাচ্চা দুইটা পাশে ঘুরিতেছে। সেতাব বলিল, কতটা বীজ ফেলবি আজ?

—জোলের দু আড়াতে ফেলাব।

—দু আড়া?

—হাঁ তো কি! তোমার মত মরা খেঁক্‌টে না কি আমি?

—তা না হয় তু ভীম ভৈরবই হলি। কিন্তু একদিনে এত ক্যানে?

—বাত চলে যাবে।

—বাত চলে যাবে সে জ্ঞানটা ভাঙ খাবার সময় থাকলে ভাল হত।

—ফ্যাচফ্যাঁচ কোরো না বেশী। এই বেটা গোরু, চল না ক্যানে। আবার নাকে ঘড়াত শব্দ করিয়া গরু দুইটার পিঠে পাঁচনের টিপ দিল এবং চলিয়া গেল।

সেতাব ডাকিল, মানকে!

—উঁ!

—বাবার মত খবরদার হাবারাম হবি নে বেটা। লোককে পাওনা ছেড়ে দিয়ে আসবি না।

—আমি ছিব হব।

—না। হবি না। খবরদার!

—কি হব?

কাজ
ধান্দ

—আমার মত হবি।

—না, তুমি ছাই। রোগা—

—ওরে বেটা, বুদ্ধিতে আমাব মত হবি। অঙ্ক শিখবি। কাউকে এক পয়সা ছাড়বি না।

—পয়সা দাও।

—ওরে বেটা, অনেক পয়সা জমিয়েছি তোর জন্যে। সব তোর জন্যে বুঝলি?

- কাউকে দোব না।

—হ্যাঁ। কেউ আমাকে দেয় নি, কেউ ছাড়ে নি মানকে। বাবা দেনা করেছিল, কেউ ছাড়ে নি। বুঝলি? আব পবিবাবের কাছে টাকা নিবি না। তোর ব-মা দেনাব সময় গযনা দিয়েছিল দেনা শোধ করতে। তার পাপ আমাকে আজও ভুগতে হচ্ছে। খববদাব মানকে। হঁ্যা!

রাখালটা হুঁকা-কল্কে সেতাবেব হাতে দিল।

সেতাব বলিল, শোন্, তু একবাব ঘোঁতন ঘোষের বাড়ি যাবি, বুঝলি? বলবি পঞ্চায়েত মোড়লেরা একবার ডেকেছে। বুঝলি?

বাখালটা বলিল, সে আসবে না গো। বড ত্যাদড নোক ঘোঁতন।

—তা হোক, তু যাবি। আমি বলছি—তু যাবি। আসে না-আসে আমি বুঝব। এই কাগজখানা দিবি।

রাখালটা বলিল, তা হলে এখুনি যাই। নইলে ঘোতন মুড়ি খেয়ে বিড়ি টানতে টানতে বেরিয়ে যাবে, আর সেই ভাত খাবার বেলা পর্যন্ত পাব না।

ঘোঁতনের বাড়ি গোপডাঙায়। ঠিক পাশের গ্রামে।

এই গ্রাম ও আধাশহর লক্ষ্মীপুরের মাঝখানে গোপডাঙা—ছোট একখানি গ্রাম। লক্ষ্মীপুরেরই কাছাকাছি বেশী। লক্ষ্মীপুর অনেকদিনের সমৃদ্ধ গ্রাম। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-প্রধান সমাজ। গোপডাঙার টানটা চিরকাল ঐ দিকেই বেশী। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকেরা গোপডাঙার চাষীদের এবং গোপদের উৎপন্নের পুরানো খরিদ্দার। গোপডাঙার তরি-তর-

না-হোক বেশ কয়েক প্রকাব
। ।বমান্ন না হোক পায়সান্নে
গ্রামেব চাষীরাই বরাবর ব্রাহ্মণ
। কবিয়া আসিযাছে। এবং সেকালে
জন বছবে নিজেব খামারে একটা মরাই-ও
।র বছরে ঠিকায ধান শোধ না করিতে পারিয়া খতও
। আসল, সুদে বাড়িয়া তাহাদেব পৈতৃক জমি বিক্রয়
।) কবিযাছে। এ সব পুবানো কথা। তাহার পর মাঝে একটা
আসিয়াছিল যখন লক্ষ্মীপুবেব ব্রাহ্মণ-কাযস্থ বাঁড়ুজ্জে মশায়, মুখুজ্জে মশায়, বোস মশায়, ঘোষ মশাযেরা সকলেই ও সব উপাধি ছাড়িয়া বাবু মশায় হইলেন, ঘরে ঘবে তক্তপোশ-ফরাসের বদলে চেয়ার টেবিল হইল, টোল-পাঠশালা উঠিযা গেল, ইংবাজী ইস্কুল হইল, বাবুরা শহরে চাকরি ধরিল। উকিল হইল, মোক্তাব হইল, ডাক্তার হইল। শববত ছাড়িযা চা ধরিল, হুকার সঙ্গে সিগারেট ঢুকিল, তখন লক্ষ্মীপুবে খান্‌সামার চাহিদাটা বাড়িযা গেল। এই সময গোপডাঙার অনেকে চাষের মত অভদ্র কাজ ছাড়িযা এই শৌখীন কাজে ঢুকিল। ছোট-বড করিয়া চুল ইহারাই প্রথম ছাঁটিল, চাদরের বদলে কামিজ আমদানি কবিল। কাছেই বক্রেশ্বব নদী -ইহাব পব বক্রেশ্বব নদী দিয়া অনেক জল বহিয়া গেল। শুধু বহিয়াই গেল না, বন্যায চারিপাশ ডুবাইয়া দিয়াও গেল। চাষেব জমিতে পলিও পড়িল, বালিও চাপিল। সেতাবদের গ্রাম নারানপুবের চাষীরা বালিপডা জমিব বালি তুলিল, পলিপড়া জমিতে সোনা ফলাইল। কিন্তু গোপডাঙার চাষীরা চাষ একেবারে তুলিয়া না দিলেও ওই জীবিকার উপর আস্থা হারাইল। তাহারা চাষের সঙ্গে এটা ওটা ব্যবসায়ে হাত দিল। কেহ নবগ্রামে দোকান করিল। মুদীর দোকান, বিড়ির দোকান ইত্যাদি এবং ছেলেদের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। দুই চারিটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করিল, একজন এম-এ পাশ করিল, একজন বি-এল হইল এবং গোপডাঙার বাস উঠাইয়া কর্মস্থল শহরে চলিয়া গেল। ঘোঁতনের বাবা গোপাল

ঘোষ নিজে চাষবাসের সঙ্গে পাইকারী অর্থাৎ ধানের দালালির কাজ ধরিয়াছিল। লক্ষ্মীপুরের বণিকদের কাছে টাকা লইয়া গ্রামে গ্রামে ধান কিনিত এবং সেই ধান গাড়ি বোঝাই করিয়া বণিকদের গদিতে পৌঁছাইয়া দিত। কিছু লাভ থাকিত দরের মাথায়, আর কিছু থাকিত ওজনের মাথায়। খরিদ্দারের ঘরে হাতের টিপে যে ওজনটা সে লাভ করিত—সেইটার দাম মিলিত। ইহার উপর কিছু আছে ঢলতা—কিছু আছে ঈশ্বরের নামে বৃত্তির ভাগ। ঘোঁতনাকে ইস্কুলে দিয়াছিল। ঘোঁতন ও সেতাব কয়েক ক্লাস একসঙ্গে পড়িয়াছিল। ঘোঁতন ছেলে মন্দ ছিল না, সেতাবদের মত সে এম্‌'কে অ্যাম, এন্‌'কে অ্যান, এল্‌'কে অ্যাল বলিত না। চোস্ত উচ্চারণ ছিল তার। লক্ষ্মীপুরের বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলিত, স্কুলে ডিবেটিং ক্লাবে ডিবেট করিত। ভাল আবৃত্তি করিতে পারিত। লক্ষ্মীপুরের থিয়েটার ক্লাবের রিহারস্যালের দিন হইতে অভিনয়ের দিন পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে আড়ালে-আবডালে থাকিয়া শুনিত শিখিত। ক্লাবের লাইব্রেরি হইতে নাটক-নভেল পড়িত। লোকে বলিত—ছেলেটির ভবিষ্যৎ আছে। মাস্টাররাও আশা করিতেন, ঘোঁতন অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করিবে। মন দিয়া পড়িলে ফার্স্ট ডিভিশনেও যাইতে পারিবে।

হয়তো পারিত। কিন্তু গোপাল ঘোষ মরিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। ঘোঁতন বল্গাশূন্য অশ্বের মত ধাবমান হইল। এবং ফার্স্ট ক্লাসে উঠিয়াই সে প্রেমে পড়িয়া গেল। মনে মনে সে বেশ কিছুদিন হইতেই প্রেমে পড়িতেছিল। স্থানীয় মাইনর গার্লস স্কুলের মাইনর ক্লাসের ছাত্রীদের প্রত্যেকটিকেই কিছু দিনের জন্য প্রিয়তমা ভাবিতেছিল। কিন্তু জাতের বাধা বা অন্য বাধা স্মরণ করিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। নিজের খাতায় তাহাদের নাম লিখিত এবং খুব যত্নের সঙ্গে কাটিত। হঠাৎ প্রকাশ্যে প্রেমে পড়িবার সুযোগ জুটিয়া গেল। স্থানীয় সবরেজেস্ট্রী আপিসে তাহাদেরই স্বজাতি এক কেরানী আসিল—এবং তাহার বড় মেয়েটি মাইনর ক্লাসে ভর্তি হইল। লম্বা ধরনের শ্যামবর্ণা মেয়ে, বয়স বোধ হয় তের বা চৌদ্দ ; কিন্তু ঘোঁতনের প্রেমে পড়িবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। মাইনর ক্লাসে পড়ে, বেণী ঝুলাইয়া ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া

স্কুলে যায়—সুতরাং ইহার চেয়ে অধিক আয়োজন আর কি হইতে পারে লক্ষ্মীপুরে। ঘোঁতন প্রেমে পড়িল, মেয়েটির বাপের সহিত আলাপ করিল। তাহাদের বাড়িসুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ি আনিয়া খাওয়াইল। এই সময়েই উমেশ মণ্ডল কাদম্বিনীর বিবাহের জন্য লোক পাঠাইল। ঘোঁতন তাহাকে সোজা "না" বলিয়া দিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। সবরেজেষ্ট্রী অফিসের কেরানী বাবুটি ভীরু। কন্যাদায়গ্রস্ত লোক, সেও ঘোঁতনকে পছন্দ করিল। মাস্টাররা বলেন—ছেলে মন্দ নয়। বাহিরে তো খুব চটপটে ---স্মার্ট। বাড়িঘরদোরও খারাপ নয়। সুতরাং আকারে ইঙ্গিতে সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিল।

ঘোঁতন খুব উৎসাহিত হইয়াই পরীক্ষা দিয়া আসিল। শহরে পরীক্ষা দিয়া ফিরিবার সময় সেলুনে চুল ছাঁটিয়া এক টিন গোল্ডেন বার্ডসাই নামক সিগারেট মিক্শ্চার কিনিয়া বাড়ি ফিরিল এবং একদা শুভলগ্নে কেরানীবাবুর মাইনর-পড়া চতুর্দশী কন্যা নীহারিকাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে গেজেটে থার্ড ডিভিশন অবধি কোথাও ঘোঁতনচন্দ্রের নাম নাই।

ঘোঁতন বলিল—শালারা সব!

শ্বশুর বলিল—আবার ভাল করে পড়।

ঘোঁতন বলিল—না, ও গোলামী লেখাপড়া আমি আর করব না।

ঘোঁতন তখন লক্ষ্মীপুরের থিয়েটারে পার্ট পাইয়াছে। সামনে মাসখানেক পরেই অভিনয়। লক্ষ্মীপুর ক্লাবের নিয়মানুসারে কোন স্কুলের ছাত্র পার্ট করিতে পায় না। স্কুলে আবার ভর্তি হইতে হইলে পার্ট ছাড়িতে হইবে। সুতরাং ঘোঁতন কিছুতেই রাজী হইল না, উপরন্তু শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শ্বশুরের বাসার পথে হাঁটা বন্ধ করিল এবং কিছু জমি বিক্রয় করিয়া লক্ষ্মী-পুরের গোলাম দর্জির সঙ্গে বখরায় একটা কাটা কাপড়ের দোকান করিল, এবং ইউনিয়ন কোর্টে পেটি মামলার তদ্বির আরম্ভ করিল। কিছু দিনের মধ্যে কাটা কাপড়ের দোকানের ভাল কাপড়গুলার জামা পরিয়া দোকানটা গোলামকে বেচিয়া দিল বটে কিন্তু মামলার তদ্বিরে তাহার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। থিয়েটারেও সে সুনাম অর্জন করিল।

মা ঘরের

শ্বশুর মেয়ের বাপ, তাহার ইচ্ছা যাই থাক, মনের ইচ্ছা মনে চা। ঈয়া জামাইয়ের কাছে নতি তাহাকে স্বীকার করিতে হইল,—সে জামাইকে বলিল —তুমি তাহলে আর একটা কাজ কর। মামলার তদ্বিরের সঙ্গেই চলবে। সব-রেজেস্ট্রী আপিসে আমি রয়েছি, তুমি সবরেজেস্ট্রী আপিসে টাউটের কাজ কর। সনাক্ত দেওয়া, দলিল লেখার কাজ কর। তা হলে মধ্যে মধ্যে যখন নকলের জন্যে একস্ট্রা হ্যাণ্ড দরকার হবে সে কাজও বলে-কয়ে করে দিতে পারব।

এ প্রস্তাবে ঘোঁতন রাজী হইল। এবং এ ব্যাপারেও সে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। কানে কলম গুঁজিয়া বড়তলায় ঘুরিতে লাগিল। কিছুদিন পর লক্ষ্মীপুরের সাহাদের পঞ্চানন সাহার সঙ্গে জুটিয়া একটা যাত্রার দলও খুলিয়া বসিল। পঞ্চানন সাহা লক্ষ্মীপুরের থিয়েটারে দূত-প্রহরী ছাড়া পার্ট পায় না, অথচ তাহার ধারণা ভাল পার্ট পাইলে সে নিশ্চয়ই নাম করিতে পারে। মধ্যে মধ্যে এ লইয়া ক্লাবে ঝগড়া-ঝাঁটিও করিত পঞ্চানন। হঠাৎ এই ঝগড়া এক-দিন চরমে উঠিয়া গেল এবং পঞ্চানন ক্লাব ছাড়িয়া দিল। কয়েকদিন পর শোনা গেল, পঞ্চানন সাহা যাত্রার দল খুলিতেছে। পঞ্চাননের পয়সা আছে, যথেষ্ট পয়সা, সে হাজার দুয়েক টাকা খরচ করিয়া পোশাক, চুল, বাদ্যযন্ত্রপাতি কিনিয়া ঘোঁতনকে ডাকিয়া বলিল—বামুন-কায়েতদের সঙ্গ ছাড়। ও বেটারা আমাদিগকে দূত-প্রহরী সাজিয়ে নিজেরা রাজা-উজীর সাজে। আমার দলে আয়, রাজা-উজীর সব আমরাই সাজব এখানে। ঘোঁতন সানন্দে জুটিয়া গেল।

পঞ্চাননের দল প্রথমেই পালা ধরিল "নাগযজ্ঞ" এবং নায়ক তক্ষক নাগের পার্ট দিল ঘোঁতনকে। ঘোঁতন তক্ষক নাগের পার্টে এমন ফোঁস-ফোঁস করিয়া ফোঁসাইল যে লোকে বাহবা দিল খুব। ঘোঁতন নিজেও খুব খুশী হইল, সত্য বলিতে পালাও জমিল।

বছর খানেক পর পঞ্চাননের শখ মিটিল, হাজার খানেক টাকা লোকসান দিয়া দল তুলিয়া দিল। তুলিয়া দিবার সময় ঘোঁতন বলিল—পঞ্চানন-দাদা! দল তুলে দেবে? কিন্তু—

কিন্তু কি? আমার শখ মিটেছে।

স্কুলে য'

— । হলে আমাকে দিয়ে দাও ওগুলো। আমাদেব শখ এখনও আছে।

কিন্তু টাকা যে অনেক লেগেছে ঘোঁতন।

তা লেগেছে। কিন্তু পঞ্চানন অপেরায় তোমার নামটা তো থাকবে। আমি টাকা কিছু দোব। আড়াই শো।

শেষ পর্যন্ত চারশো টাকায় রফা করিয়া পঞ্চানন সাহাকেই বিঘা দুয়েক জমি সাতশো টাকায় বেচিয়া ঘোঁতন দলের সরঞ্জাম কিনিল এবং বাড়িতে সামনের চাষের সরঞ্জামের ঘরখানার মেজে বাঁধাইয়া—দেওয়ালে কলি ফিরাইয়া—বাহিরে পঞ্চানন অপেরার সাইন বোর্ড খাটাইয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল—O. K ঠিক হয়েছে।

প্রথম বছর দুই-তিন জমজমাট আসর চলিয়াছিল ঘোঁতনের। তখন যুদ্ধ মিটিয়াছে কিন্তু বাজারে তখন অঢেল কাগুজে টাকা। তাহার পর মন্দা পড়িয়াছে। ঘোঁতনের যাত্রার দলে লোকসান যাইতে শুরু করিল। ওদিকে রেজেস্ট্রী আপিসে মন্দা পড়িল। ঘোঁতনের স্ত্রী চার-পাঁচ বছরে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়া সংসার বৃদ্ধি কবিল, নিজে রোগে পড়িল। বোন পুঁটি বড় হইয়া পনেরো পার হইয়া পড়িল ষোলো বছরে। মা মেয়ের বিবাহের জন্য তাগিদ দিলেও ঘোঁতন চঞ্চল হইল না। স্পষ্ট বলিয়া দিল—আমার টাকা নাই। ইহার মধ্যে আরও বিঘা তিনেক জমি নিলাম হইয়া গেছে। ঘোঁতন আপীল করিয়াছে। তাহার উপর পর পর দুবছর অনাবৃষ্টিতে ফসল নাই। ঘোঁতন করিবেই বা কি? গতবছর সেতাবের কাছে ধান লইয়াছিল। ভরসা করিয়াছিল ওই পাগল মহাতাপের। পাগলটাকে যাত্রার দলে ঢুকাইতে পারিলে পার্টের লোভ দেখাইয়া অন্তত বছরের খোরাকির ধানটার সংস্থান হয়। কিন্তু যাত্রাটাত্রা মহাতাপ বুঝে না। তার চেয়ে সে সঙ ভালবাসে, সংকীর্তন ভালবাসে। বাঁয়া তবলার চেয়ে খোল বাজাইতে তাহার উৎসাহ বেশী। এবার সেইজন্য মহাতাপকে গাজনের সঙে শিব সাজাইয়াছিল। দশ টাকা চাঁদাও লইয়াছে। আবার ধান ছাড়িয়া দিলাম বলিয়া লিখিয়া লইয়াছে।

* * *

রাখালটা যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিল, তখন ঘোঁতনের মা ঘরের দাওয়াটা মাটি দিয়া নিকাইতেছে। ঘোঁতন চায়ের একটা বাটি লইয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছে। এক হাতে একটা জ্বলন্ত বিড়ি। রুখু চুলগুলা উড়িতেছে। চোখে উদাস দৃষ্টি। সে ভাবিতেছিল পার্টের কথা।

রাখালটা আসিয়া বলিল, ঘোষবাবু মশায়!

—কে? তাহার দিকে ঘোঁতন তাকাইল।—সেতাব মোড়লের রাখাল না তুই?

—হ্যাঁ গো। এই কাগজটা দিলে মুনিব। তোমাকে যেতে বলেছে একবার।

কাগজটা দেখিয়া ঘোঁতন দাঁতে দাঁত টিপিয়া ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গিসহকারে বলিল, এক কিলে বেটার দাঁত কটা ভেঙে দোব। নোটিশ এনেছে, পঞ্চায়েতের নোটিশ! ভাগ, ভাগ বলছি! ভাগ!

রাখাল বলিল, তা আমি কি করব? ওই! আমাকে পাঠালে—। ওই—বলিতে বলিতেই সে পিছাইতে শুরু করিল।

ঘোঁতন চায়ের বাটি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—

ঘোঁতনের মা ত্রস্ত হইয়া বলিল, ও ঘোঁতন, ওরে! কি হল রে?

—কিপটে কঞ্জুস পেকো সেতাবের রাখাল বেটা নোটিশ নিয়ে এসেছে. পঞ্চায়েতের নোটিশ। I don't care—ওরে বেটা বলে দিবি, ঘোঁতন ঘোষ don't care—I mean does not care.

মা আবার বলিল, ঘোঁতন!

ঘোঁতন বলিল, আমি মাছে পোকা পড়িয়ে দেব। হুঁ-হুঁ—আমি ঘোঁতন ঘোষ! আমি হোৎ-তা-তা লাঙল ঠেলি না। আকাট মুখ্যু নই আমি। সেতাব মোড়লের বাড়ির কীর্তি ফাঁস করে দোব, গুপ্ত বিন্দাবনের পালা লিখে ছড়িয়ে দেব।

মা এবার কঠিনস্বরে বলিল, ঘোঁতন, তোর মুখ খসে যাবে, ও কথা বলিস নে। ঘোঁতন কি বলিতে চাহিতেছে মুখ খুলিবামাত্র সে তাহা বুঝিয়াছে।

ঘোঁতন ভেঙাইয়া বলিল, আ মলো যা। তোর দরদ উথলে উঠল যে?

—তুই যা বলছিস, তা আমি বুঝেছি। চাঁপাডাঙার বউ সতীলক্ষ্মী। মহাতাপ বোকা হোক, মুখ্যু হোক, তোর মত ফেশানদুরস্ত ভদ্দনোক না সাজুক, বড় ভাল ছেলে। আমি চোখের জল ফেলে নিজের দুঃখের কথা বললাম তো এক কথায় পাওনা ধান ছেড়ে দিলে—

—দিলে? এই তো সেতাব মোড়ল পঞ্চায়েতের নোটিশ দিয়েছে।

—দিক। সে যখন বলেছে তখন সেতাব কখনও কথা ফেরাবে না। তার উপর কাদু আছে। সে আমার সইয়ের মেয়ে।

—না! ফেরাবে না! একটা আধপাগলা মুখ্যু, একটা উল্লুক, একটা পাঁঠাতে আর মহাতাপে কোন তফাত নাই। ঘরে খাবার আছে, সম্পত্তি আছে, তারই জোরে আমাদের চেয়ে তার খাতির! সব কলঙ্ক ঢাকা পড়ছে।

মা এবার মাটি-গোলার হাঁড়িটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, দেখ্‌ ঘোঁতন, অন্যায় কথা বলিস না। তোর যেমন পাপ মন তেমনি কূটবুদ্ধি। তত তোর মনে হিংসে। অমৃতিকে তুই বিষ বলছিস। ছি! ছি!

—যাও, যাও, মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না বলছি। বিড়ি টানিয়া ঘোঁতন খানিকটা ধোঁয়া উড়াইয়া দিল।—আমি হাটে হাঁড়ি 'ব্রেক' করে দোব বাবা। হুঁ! হুঁ!

বলিয়া সে হাঁটু দোলাইতে লাগিল।

মায়ের দাওয়া নিকানো শেষ হইয়াছিল। মাটি-গোলা হাঁড়িটা হাতে লইয়া সে দাওয়া হইতে নামিয়া পাঁচিলের গায়ে সদর দরজা দিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেছিল, ঘোঁতনের কথা শেষ হইতেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমার হাঁড়ি যে ভেঙে আটকুচি হয়ে আছে বাবা। চাঁপাডাঙার মেয়ে কাদুর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ছেলে বয়েস থেকে; তুমি বাবা চালক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিয়ে—বিয়ে করলে নিজে পছন্দ করে। বউমা ভাল, নিন্দে করব না বাবা, কিন্তু সবেরই তো পয় আছে—ভাগ্যি আছে; তোমার বউয়ের ভাগ্যি বলতে কিছু নাই। তা ছাড়া ধন্যি বাপের মেয়ে,

বাপ সেই যে—আলতাহুটি-শাঁখেরকুটি দিয়ে বিয়ে দিয়ে চলে গেল এখান থেকে আর খোঁজ করলে না। আর কাদুর বাপ মরবার সময় মেয়েকে দিয়ে গেল এতগুলি গহনা। আজ. কাদুকে দেখে দশখানা গাঁয়ের লোকের চোখ জুড়োয়। বলে মরি মরি—কি লালিত্যি! এ রাগের কথা—লোকে না জানুক, আমি জানি। এতে তোমার অকল্যেণ হবে বাবা। আমার সইয়ের মেয়ে সে আমার মেয়ের তুল্য। বিয়ে যখন হয় নাই—তখন তাকে বোন ভাবা উচিত তোমার। কিন্তু—তুমি –। প্রৌঢ়া আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ঘোঁতন এবার হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের চায়ের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া বলিল, চিরকালের ঘরজ্বালানী পরঢলানী যে তুমি। কাদু তোমার সইয়ের মেয়ে—সে তোমার পেটের ছেলের চেয়ে আপন! তার জন্যে আমার উপর রাগ! ফু-ফু! ফু!

রাস্তায় নামিয়া খানিকটা আসিয়াই সে দেখিল, সেতাবের রাখাল ছোঁড়াটা একটা আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া গাছে ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছিল। ঘোঁতনা তাহাকে দেখিয়া ডাকিল, এই ছোঁড়া, শোন্ তো! এই! তাহার মাথার মধ্যে একটা মতলব খেলিয়া গেল।

ছোঁড়াটা ছুটিতে উদ্যত হইতেই ঘোঁতন একটা ঢেলা তুলিয়া বলিল, পালাবি তো ঢেলা মেরে ঠ্যাঙ খোঁড়া করব তোর। শোন্!

ছোঁড়াটা থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘোঁতন আগাইয়া আসিয়া বলিল, তোর ছোট মনিব কোথা? একবার ডেকে দিতে পারিস?

—ছোট মুনিব মাঠে।

—মাঠে?

—হঁ। বীজ বুনতে গিয়েছে।

ঘোঁতন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বিড়ি খাবি?

—বিড়ি? দেবেন আপুনি? সত্যি?

--এই নে না।

একটা বিড়ি তাহাকে দিয়া নিজে একটা বিড়ি মুখে পুরিয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া, নিজের ধরানো বিড়িটা রাখালটার বিড়িতে ঠেকাইয়া দিয়া বলিল, টান্।

রাখালটা হুস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল।

ঘোঁতন বলিল, হাঁ রে, তোদের ছোট মুনিব আর বড় মুনিবে নাকি ঝগড়া হয়?

—দিনরাত। সেই যে বলে, সাপে নেউলে।

—কেনে বল তো?

—ছোট মুনিব মানুষটা যে কেমন গো! লোকের কাছে ঠকে আসে। লোককে পাওনাগণ্ডা ছেড়ে দেয়। টাকা হাতে পেলেই খরচ করে দেয় এই বড় মুনিবের রাগ। আর ছোট মুনিবের রাগ, বড় মুনিব কেপন। বড় মুনিব বকে। সবচেয়ে বেশি রাগে, মোল্যানকে বকে বলে।

—হু। বড় মোল্যানের সঙ্গে মহাতাপের খুব মাখামাখি—না রে?

—ওরে বানাস্! বড় মোল্যান ছাড়া কথা নাই ছোট মুনিবের। সে য বলবে তাই বেদবাক্যি।

—তোদের ছোট মোল্যান রাগ করে না?

—করে না আবার? করে, মাঝে মাঝে ফোঁসফোঁসও করে! তা ছোট মুনিব বলে—নেহি মাংতা হ্যায়, চলে যা বাপের বাড়ি। বড় মোল্যা আবার বকে ছোট মুনিবকে। ছোট মোল্যানকেও বকে খুব।

—হুঁ। একটু ভাবিয়া লইয়া ঘোঁতন বলিল, ভাল ছেলে তুই—তোবে আমার যাত্রার দলে একটা পার্ট দোব। বুঝলি? করবি?

বার বার সে ঘাড় নাড়িল। মনে মনে মাকে ব্যঙ্গ করিল। চাঁপাডাঙা বউয়ের উপর মায়ের বড় দরদ। অথচ রাখাল ছোঁড়া কি বলিয়া গেল? তাহা মানে কি? নয়ানপুরের যত সব ভেড়ার দল—সৈতাব-মহাতাপের অবস্থাবে ভয় করিয়া মুখ খুলিতে সাহস করে না! দেওর-ভাজের মাখামাখিরও একট সীমা আছে! রাখালটাকে হাত করিয়া ঠিক খবরটা বাহির করিবে সে

আজকালকার ভাল ভাল উপন্যাসে নরনারী-তত্ত্বের জীবন-রহস্য সে জলের মত বুঝিতে পারিয়াছে!

ছেলেটা খুশি হইয়া ঘাড় নাড়িল।

ঘোঁতন আবার প্রশ্ন করিল, এখন বল্ তো কোন্ মাঠে বীজ পাড়ছে তোর ছোট মুনিব?

—ওই তো গো আপনার কাছে কেনা—কাঁড়াজোলের সেই বেঁকী বাকুড়ির মাথায়।

কাঁড়াজোলের মাঠ। এখানে ওখানে লোকে হাল বহিতেছে। বৈশাখ মাস বীজ বুনিবার সময়। মহাতাপ লাঙল চালাইতেছে। তাহার বলিষ্ঠ দেহের সকল শক্তিতে লাঙলের মুঠা চাপিয়া ধরিয়াছে। গোরু দুইটা চলিয়াছে মন্থর গমনে।

কৃষাণটা কোদাল কোপাইয়া আলের মুখ কাটিয়া জল-নির্গমের পথ করিয়া দিতেছিল।

এমন সময় আসিয়া দাঁড়াইল ঘোঁতন। ডাকিল, মহাতাপ!

মহাতাপ মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, ভাঙ খাবার দলে আমি নাই, যা।

—একটা বিড়ি খা।

—বকিস না, আমার সময় নাই। দু আড়া বীজ ফেলতে হবে আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে নাকে তালুতে ঘড়াৎ শব্দ করিয়া গোরু দুইটাকে তাড়া দিয়া বলিল, অই-অই, বেকুব বেহুদ্দা গোরু কোথাকার! অই-অই, আবার শব্দ! কহিল—ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা।

ঘোঁতন বলিল, ওরে দাঁড়া, শোন্। কথাটা বেশ ধমকের সুরেই বলিল।

—কি?

—বলি মানুষের কথা কটা রে?

—ক্যানে? কথা একটা। দু কথার মানুষ মহাতাপ নয়।

—তবে?

—কি তবে! মহাতাপ লাঙল ছাড়িয়া দিল এবার।

—তুই যে দাতাকর্ণ সেজে মাকে পাওনা ধান ছেড়ে দিয়ে এলি—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সে তোর মায়ের জন্যে দিয়েছি। তোর জন্যে নয়।

—বুঝলাম। তা তোর দাদা আবার ধান চায় কেন ?

—কি ?

—তোর দাদা, কিপটে সেতাব—

—এক চড়ে তোর দাঁত ভেঙে দোব ঘোঁতনা। কিপটে আছে আপন ঘরে আছে, তুই কিপটে বলবি ক্যানে ?

—সে ধান চায় ক্যানে ? পঞ্চায়েত ডাকে ক্যানে ?

—যা যা, ঘর যা। সে আমি বড় বউকে বলে দোব। সে সব ঠিক করে দেবে।

—বড় বউকে বলে ঠিক করে দিবি ? ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল ঘোঁতন। ঘাড় নাড়িয়া খুব রসিকের মত হাসিয়াই বলিল, হ্যাঁ হ্যা তাই দিস। কথার শেষে সে আরও খানিকটা হাসিল।

মহাতাপ তাহার হাসি দেখিয়া ক্ষেপিয়া গেল, বলিল, হাসছিস যে ? এই, তুই হাসছিস যে ?

ঘোঁতন বিজ্ঞের মত বলিল, হাসলাম। তা তুই রাগছিস ক্যানে ?

—তু হাসবি ক্যানে ? মহাতাপ আরও দুই পা আগাইল।

—ওই ! ওই ! সে পিছাইতে লাগিল।

মহাতাপ খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—বল্ ব্যাটা ফড়িং, হাসলি ক্যানে ? এমন করে হাসলি ক্যানে বল্—

—ছাড়্, ছাড়্, ছাড়্— ওরে বাপ রে !

নোটন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছোট মোড়ল, ছাড়, ছাড়, ছোট মোড়ল—

দূর হইতে কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ঠাকুরপো !

দূরে একটি গাছতলায় বড় বউ কাদম্বিনী হাতে গামছায় বাঁধা জলখাবার লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; মাথায় বিড়ার উপর জলের ঘটি। মাঠে চাষের কাজের সময় চাষীদের বধূরাও মাঠে স্বামীপুত্রের জন্য জলখাবার লইয়া যায়। সেতাব ভরা চাষের সময় ছাড়া চাষে খাটে না। হিসাবনিকাশ দেনাপাওনা বীজের ব্যবসা লইয়া তাহার অনেক কাজ। মহাতাপের চাষ লইয়া মাতন।

ছোটবউকে সমাদর করিয়া কাছু মাঠে বাহির হইতে দেয় না। তাহার উপর পাগলকে তো বিশ্বাস নাই ; কোথায় মাঠেই ঝগড়া করিয়া বসিবে মানুষ সঙ্গে। তাহার যদি মনে হয়—গুড় কম কি মুড়ি নরম—তাহা হইলে এক কাছু ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে—তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বুঝাইয়া খাওয়াইতে পারে। মহাতাপের জন্য জলখাবার লইয়া আসিয়া গাছ-তলায় দাঁড়াইয়াই তাহার চোখে পড়িল ঘোঁতন দাঁড়াইয়া আছে, কি কথা বলিতেছে। কথাটা যে ধানের কথা তাহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না। মুহূর্ত পরেই মহাতাপের উচ্চ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। তাহারও মুহূর্ত পরে মহাতাপকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া তাহাকে চীৎকার করিয়া না ডাকিয়া পারিল না।

মহাতাপ চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল।

নোটন বলিল, বড় মুনিব্যান।

দূর হইতে কাছু বলিল, ছেড়ে দাও ঠাকুরপো। ছেড়ে দাও।

মহাতাপ ঘোঁতনকে ছাড়িয়া দিল, যা বেটা আলকাটার কাপ, আজ তোকে ছেড়ে দিলাম। ফের দিন তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকা পাকিয়ে দোব।

ঘোঁতন হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল।

মহাতাপ গাছের তলায় গিয়া বসিল, ব্যাটা হাসে। দেখ তো কাণ্ড!

কাদম্বিনী বলিল, কি হল তাতে? হাসি তো ভাল জিনিস।

—ভাল জিনিস? ওই হাসি ভাল জিনিস? ভাল জিনিস তো গা জ্বলে যায় ক্যানে?

—নাও, ভিজে গামছায় গা মুছে ফেল। জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। একটু বুদ্ধি কোরো। বুঝলে, সব তাতেই মারমূর্তি ভাল নয়।

—তুমি এই কথা বলছ? তোমার কথায় কখনও রাগি আমি?

বড় বউ জলের ঘটি আগাইয়া দিল।—মুখ ধোও। হাত ধোও।

মহাতাপ হাতমুখ ধুইতে লাগিল।

বড় বউ বলিল, আমার কথায় রাগো না সে তো কথা নয়। পরের কথাতেই বা রাগবে কেন? ছি! কি হল কি? ঘোঁতন হাসলেই বা ক্যানে?

—ক্যানে! এবার মহাতাপ চেঁচাইয়া উঠিল—ক্যানে! তোমার না꞉
করে হাসলে ক্যানে?

বড় বউ তাহার মুখের দিকে তাকাইল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, আমার
নাম করে?

—হাঁ। আবার হাসছে যেন মদ খেয়ে হাসছে। দাও মুড়ি দাও।

বলিয়া মুড়ির খোরাটা টানিয়া লইল। হুস করিয়া জল ঢালিয়া দিল
গুড়ের বাটি হইতে চামচখানেক গুড় লইয়া মিশাইয়া দিল। তারপর
বলিল, ব্যাটার হাত ভেঙে দিতাম।

বড় বউ কাদম্বিনী বিচিত্র হাসি হাসিল। -তার চেয়ে ওরা হাসুক
হাসতে দাও ওদের। পরের হাত ভেঙে তোমাকে ফ্যাসাদ বাধাতে হবে না

প্রকাণ্ড হাতে মুড়ির গ্রাস তুলিতে গিয়া মহাতাপ বলিল, এমনি করে
হাসবে ঘোঁতনা?

—যাঁর বিচারের ভার তিনিই বিচার করবেন। ওতে আমার গায়ে
ফোস্কা পড়বে না। কিন্তু ও আবার তোমার কাছে এসেছিল কেন?

—ওই দেখ। ভুলে যেতাম এখুনি। তুমি সেই কেপনকে বোলো তে
আমি ঘোঁতনকে যে ধান ছেড়েছি সেটা এবার চাযে ফলিয়ে দোব—দোব-
দোব।

বলিয়াই সে বড় বড় গ্রাসে খাইতে লাগিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বড় মোড়ল বুঝি ছাড়বে না
বলেছে?

খাইতে খাইতেই মহাতাপ বলিল, পঞ্চায়েত ডেকেছে। আজ
সন্ধ্যেবেলা।

চাঁপাডাঙার বউ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না-না-না। সে ঘোঁতনের জন্য
নয়। আজ পঞ্চায়েত বসবে—শিবকেষ্ট রামকেষ্টদের হাঁড়ি আলাদা হবে
বিষয় ভাগ হবে।

—উঁহু, ঘোঁতনা বলে গেল। কেপনের সর্দার লোক পাঠিয়েছিল।

চাঁপাডাঙার বউ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিয়া লইল।

মহাতাপ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া বলিল, তুমি বোলো যেন !

—বলব। বলব। তুমি খাও।

—বাস। নিশ্চিন্দি তো ?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

—এবার এমন চাষ করব—দেখবে।

—কোরো। এখন খেয়ে নাও।

মহাতাপ বড় বড় গ্রাসে মুড়ি খাইতে লাগিল।

চাঁপাডাঙার বউয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না ব্যাপারটা। সে মণ্ডলবাড়ির গৃহিণী, সেতাবও বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি হিসাবে এখানকার পঞ্চায়েতের একজন মণ্ডল, গ্রামের সকল খবরই তাহাদের পক্ষে জানা স্বাভাবিক। রামকেষ্ট এবং শিবকেষ্ট দুই ভায়ের মধ্যে বনিবনাও অনেক দিন হইতেই হইতেছে না। কাজেই তাহারা ভিন্ন হইতে চলিয়াছে। সেইজন্য আজই সন্ধ্যায় পঞ্চায়েত বসিবার কথা। এই সুযোগ লইয়া সেতাব ঘোতনের ব্যাপারটাও পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে—কথাটা মুহূর্তে কাদম্বিনী বুঝিয়া লইল। ব্যাপারটা কাদম্বিনীর ভাল লাগিল না। সেতাবের উপর সে বিরক্ত হইল। এ কি ? এই স্বভাবটা কি তাহার কোন দিন যাইবে না ? একদিন যখন অবস্থা খারাপ ছিল তখনকার কার্পণ্যের কথা সে বুঝিতে পারে। আজ এত কার্পণ্য কেন ? তা ছাড়া মহাতাপ বুদ্ধিহীন লোক, সেও তো বাড়ির অর্ধেকের মালিক ! তাহার অপমান হইবে যে ! মহাতাপকে সে স্নেহ করে। মহাতাপ সরল, নির্বোধ, মাথাতেও একটু ছিট আছে—তাহার উপর ভাঙ খায়, লোকের সঙ্গে মারামারি করিয়া আসে, জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করিয়া আসে ; সবই সত্যি। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় মায়ের কথাটাও কি মনে পড়ে না সেতাবের ? চাঁপাডাঙার বউয়ের বয়স তখন পনেরো-ষোলো বৎসর—মহাতাপের চোদ্দ-পনেরো, মৃত্যুশয্যায় শাশুড়ী বউকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—বউমা, ওই পাগলকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তুমি ওকে রেখো।

মহাতাপকে ডাকিয়া মা বলিয়াছিল—বড় ভাজ আর মায়ে সমান।

চাঁপাডাঙার বউয়ের কথা কখনও অমান্যি করবি নে। ও আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

সেতাবকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—সবই তোমার ভার বাবা। বউমার অযত্ন কোরো না, ওই হল এ বাড়ির ঘরের লক্ষ্মী। তুমি বউমাকে দেখো; মহাতাপকে দেখো।

চাঁপাডাঙার বউ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা শুধু কর্তব্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে তাহার অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহের যোগ আছে। বুদ্ধিহীন মহাতাপ আজও সেই ছেলেবেলার মত চাঁপাডাঙার বউকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। তাহার ক্রোধ হইলে সে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। প্রতিশোধ না লইতে পারিলে সে মেঝের উপর মাথা কোটে। সে সময় তাহার সম্মুখে কেহ দাঁড়ায় না। দাড়ায় ওই চাঁপাডাঙার বউ। চাঁপাডাঙার বউ দাঁড়াইলেই মহাতাপের ক্রোধের মাত্রা কমিয়া আসে। সেই মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকায়। চাঁপাডাঙার বউ বলে, ছি! ছি!

মহাতাপ প্রথমটায় প্রতিবাদ করে।

বড় বউ আবার বলে, ছি! ছি! তোমার জন্মে ছি-ছি করে সারা হলাম। চিরকালই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে?

মহাতাপ এবার নিজের দিকের ন্যায়কে প্রবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

বড় বউ বলে, সব বুঝেছি। অন্যায় ওদেরই। কিন্তু সংসারে যে সয়—সেই মহাশয়!

মহাতাপ শান্ত হয়।

মহাতাপের বিবাহও সেই দিয়াছে। মানদা তাহারই জ্ঞাতিকন্যা।

মানদা মেয়েটি দেখিতে বড় ভাল। তাহার উপর কাজে কর্মে এমন পারঙ্গম মেয়ে চাষীর বাড়িতেও বিরল। শুধু সেতাবই কি সব ভুলিয়া গেল? দিন দিন পয়সা পয়সা করিয়া সে কি হইতে চলিল!

চাঁপাডাঙার বউয়ের সদাহাস্যময়ী মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া গেল। স্বামীর এই আচরণের সংবাদে মর্মাহত হইল। মহাতাপ এ বাড়ির অর্ধেকের মালিক, তাহার বুদ্ধি নাই কিন্তু তাহার সবল শরীরের পরিশ্রমেই জমির ধানে এ বাড়ির

খামার উথলিয়া উঠে। শুধু তাই নয়—তাহাদের সন্তান নাই, ওই মহাতাপের ছেলে মানিকই এ বংশের উত্তরাধিকারী।

বিষণ্ণ মন লইয়াই সে বাড়ি ফিরিল।

খামার-বাড়িতে কতগুলা কুমড়ার লতা মাচায় উঠি-উঠি করিতেছে, সেতাব একখানা কোদাল লইয়া সেগুলার গোড়ায় চারা করিয়া দিতেছে। পাঁচিলের গোড়ায় হুঁকা-কল্কে ঠেকানো রহিয়াছে।

তাহার অনতিদূরে বসিয়া আছে—রামকেষ্ট ও শিবকেষ্টর দুই বিধবা খুড়ী। বয়সে চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কাছাকাছি—ইন্দাশের বউ ও টিকুরীর বউ। দুজনেই উবু হইয়া বসিয়া আধঘোমটা দিয়া কথা বলিতেছে, একজন একটা লাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতেছে।

একজন বলিতেছে, শিবকেষ্ট রামকেষ্ট ভেন্ন হবে বাবা, তোমরা পঞ্চায়েত মিলে ভাগ করে দিচ্ছ; কিন্তু আমাদের কি হবে, বল?

সেতাব একটু রূঢ়স্বরেই বলিল, সে একা আমাকে বললে কি হবে?

—মোটা মোড়ল তোমাকেই বলতে বললে বাবা। বললে, তোমরা বাপু সেতাবের কাছে যাও। বয়সে ছোট হলেও তার কথাই বিকুবে। তার অবস্থা ভাল। বলতে হেন লোক নাই যে সেতাবের কাছে ধান হোক টাকা হোক ধারে না। শিবকেষ্টদেরও দেনা রয়েছে।

সেতাব কোদালটা রাখিল, বলিল, মিছে কথা খুড়ী, মিছে কথা। দুনিয়া হয়েছে নেমখারামের দুনিয়া। বুঝলে খুড়ী, নেমখারামের দুনিয়া। এই দেখ, ওই ঘোঁতন—সেই যাত্রার দলের আলকাটার কাপ, তাকে পঞ্চায়েতে আসতে বলেছিলাম, তা সে বলেছে—নেহি যাঙ্গা।

বউ দুটির একজন বলিল, শিবকেষ্ট রামকেষ্ট তা বলতে পারবে না বাবা। তোমার ঘরে তমুসুদে বাঁধা। তুমি বললে—তোমার কথা অমান্যি করতে পারবে না।

সেতাব গিয়া হুঁকা-কল্কেটা তুলিয়া লইল, টানিতে টানিতে আসিয়া বলিল, তা তোমরা বলছ কি? কথাটা কি?

চাঁপাডাঙার বউ ইহার মধ্যে কখন আসিয়া ঢুকিয়াছিল। সে আগাইয়া

আসিয়া বলিল, কথা আর কি ? বিধবা বউ, তাদের খাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে! তা না করে দিলে হবে ক্যানে? তা হলে তোমরা কিসের পঞ্চায়েত ?

একজন বিধবা বলিল, এই হয়েছে। বউমা এসেছে। বল মা, তুমি বল তো। তুমি বলে দাও সেতাবকে।

সেতাব তাড়াতাড়ি বলিল, আহা, তাই তো বলছি গো! তোমরা কি চাইছ তা বল ? বলি আলাদা করে থাকতে চাও, না, ওদের সংসারে থাকতে চাও, তা বলতে হবে তো।

একজন বিধবা বলিল, আলাদা হলেই তো ভাল বাবা। স্বাধীন মতে থাকতে পাই।

সেতাব উৎসাহের সঙ্গেই বলিল, তাই হবে। আলাদাই থাকবে। তুজনকে খানিকটা করে জমি দিতে হবে তুই ভাইকে।

অন্য বিধবা বলিল, তাতে মোটা মোড়লের মত নাই। বলেছে, সে বলতে পারব না বাপু। তোমরা তুদিন পর কাউকে যদি জমি বিক্রি কর—

সেতাব বলিয়া উঠিল, করে তো করবে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, না। মোটা শ্বশুর ঠিক বলেছে। তাতে সংসার নষ্ট হবে। খুড়ীদিগেও তো ভাবতে হবে—সংসার শ্বশুরের সংসার, স্বামীর সংসার। রামকেষ্ট শিবকেষ্টই তো খুড়ীদের জল দেবে। তোমরা তা কোরো না খুড়ী, তোমাদের অধর্ম হবে।

—কিন্তু হতচ্ছেদ্দা করবে যে বউমা!

—ছেদ্দা কেউ কাউকে আপনা থেকে করে না খুড়ী, ছেদ্দা করাতে হয়। তুমি যার বাড়িতে থাকবে তাকে যদি পেটের ছেলের মত ভালবাস, তার সংসারে নিজের সংসার বলে খাটো তবে ছেদ্দা না করে সে যাবে কোথায় ?

সেতাব ইতিমধ্যে কয়েকবার হুঁকায় ব্যর্থ টান দিয়া ধোঁয়া বাহির করিতে না পারিয়া বসিয়া কল্কেটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। এবং মধ্যে মধ্যে বিরক্তিভরে আপন মনেই হুঁঃ—হুঁঃ করিতেছিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কথাটা শেষ হইতেই সে বলিল, তাই

যা হয় হবে খুড়ী, যা হয় পঞ্চজনে করা যাবে। সন্ধ্যেবেলায় এসো বুঝলে? উ তোমরা বললেও হবে না, চাঁপাডাঙার বউ বললেও হবে না। আমরা পঞ্চজনে বুঝে-সুঝে যা হয় করব। হ্যাঁ, সে যা হয় হবে। সন্ধ্যেবেলাতে এসো চণ্ডীমণ্ডপে।

—তাই আসব বাবা।

বিধবা দুইজন চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইতেই সেতাব সেইদিকে তাকাইয়া দেখিয়া আপন মনেই বলিল, এই মেয়েলোকের মুড়ুলি আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

বড় বউ বিধবা দুইটির পিছন পিছন দরজা বন্ধ করিতে গিয়াছিল। দরজা বন্ধ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা পারবে কেন? খুড়ীদিগে জমির ভাগ বার করে দিয়ে জমিটা কিনে নেবার মতলবে ঘা পড়ছে বুঝি? সেই মতলব মনে এসেছে? ছি-ছি-ছি!

সেতাব ধরা পড়িয়া গেল। হঠাৎ সেই মতলবই তাহার মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি মতলবের কথাটা নিজের কাছেও ভাল করিয়া পরিষ্কার হয় নাই। ঠিক যেন রোগ-সংক্রামিত দেহের প্রথম অবস্থার মত। কেহ বলিয়া দিলে বুঝিতে পারে—তাই তো শরীরটা অসুস্থই তো হইয়াছে। চাঁপাডাঙার বউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিক ধরিয়াছে তাহাকে। সে চমকিয়া উঠিল। সেই চমকানির ধাক্কায় হাতের কল্কেটা উল্টাইয়া গেল, হুঁকোটা পড়িয়া গেল। সে চাঁপাডাঙার বউয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, তোমার দিব্যি, এই হুঁকো ছুঁয়ে বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, আমি মরে গেলেই বা তোমার কি? আর হুঁকো ছুঁয়ে মিথ্যে বলেই বা সংসারে কি হয় শুনি?

সেতাব অপ্রতিভ হইয়া বলিল, হুঁকো ছুঁয়ে বললেই বা কি হয়? তুমি মরে গেলেই বা আমার কি?

—হ্যাঁ গো! বল না কি হয়?

সেতাব আছাড় মারিয়া হুঁকাটা ভাঙিয়া ফেলিল; বলিল, হুঁকোর কিছু না বলেছে! এই নে।

—এইবার কোদাল দিয়ে আমার মাথাটা কাটো!

সেতাব চীৎকার করিয়া উঠিল, চাঁপাডাঙার বউ! যা-তা বোলো না বলছি।

চাঁপাডাঙার বউ খুব গম্ভীরভাবে বলিল, পরের ঘর ভাঙতে যেয়ো না। তোমার নিজের ঘর ভেঙে যাবে।

সেতাব এবার হাত জোড় করিয়া বলিল, জোড় হাত করছি চাঁপাডাঙার বউ, তুমি থাম—তুমি থাম।

চাঁপাডাঙার বউ সঙ্গে সঙ্গে গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, তুমি হাত জোড় করলে, আমি তোমাকে পেনাম করছি। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া বলিল, আরও একটা কথা তোমাকে বলি। ঘোঁতন ঘোষের ধান মহাতাপ ছেড়ে দিয়েছে, তুমি তবু লোক পাঠিয়ে পঞ্চায়েতে ঘোঁতনকে ডেকে পাঠিয়েছ। ভাল কর নি। ও-কথা আর তুলো না।

সেতাব চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, ইয়েকে বলে, ই তো ভারি ফেসাদ জুড়ে দিলে! পাওনা ধান ছেড়ে দোব?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মহাতাপের মানের চেয়ে ধান বড় হল? তার অপমান হবে।

—বোকা পেয়ে তাকে ঠকিয়ে নিলে, তাতে অপমান হয় না আর—

না, হয় না। যে দান করে সে দাতা। দাতার বোকা বুদ্ধিমান নাই। মহাতাপ দান করেছে। তাকে যদি খাটো করতে যাও, তবে আমি উপোস দেব বলে দিলাম।

বলিয়া সে হনহন করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সেতাব নিজের মাথার চুল খামচাইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি মানি না, মানি না। কারুর কথা আমি মানি না। আমি সেতাব মোড়ল। বলিয়া সেও বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউকে সে ভয় করে। আবার তাহাকে নহিলে তাহার একদণ্ড চলে না।

চাঁপাডাঙার বউ যেন তাহার বুকের ভিতরটা দেখিতে পায়। কোন কথা তাহার কাছে গোপন থাকে না। তার উপর তার কাটা-কাটা কথা। সেতাব থই পায় না। আবার বিচিত্র চাঁপাডাঙার বউ, সে তার বাপের মৃত্যুকালে দেওয়া হাজার টাকা দামের গহনা সেতাবের হাতে দিয়া হাসিয়া বলে---টাকার অভাবে তুমি নীলেমে লক্ষ্মীপুরের বাবুদের চরের জমিটা কিনতে পারছ না, জমিটা হাতছাড়া হলে তোমার দুঃখ হবে। কিনে ফেল জমিটা। পরে আমাকে টাকা দিয়ো।

লক্ষ্মীপুরের বাবুদের চরের জমি---সোনা-ফলানো চর। সেখানে এক-একটা তরমুজ হয় পাঁচসের ওজনের। সেই জমি কেনার পর, মণ্ডলবাড়ি আবার পূর্বের শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে। আগের অবস্থাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু---। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার হুকুমে ওই ঘোঁতনের মত পাষণ্ড উদ্ধত শয়তানকে পাওনা ছাড়িয়া দিতে হইবে। ঘোঁতনকে সে দু-চক্ষে দেখিতে পারে না। সেই স্কুল-জীবন হইতে! মহাতাপের অপমান হইবে? মহাতাপ তাহার মায়ের পেটের ভাই। বিষয়-সম্পত্তি, এই ভূতের বেগার খাটা কাহার জন্য কিসের জন্য? তাহার নিজের জন্য? সে খায় ক-মুঠা? পরে কি? তাহার নিজের সন্তান আছে? সে খাটে মণ্ডলবাড়ির জন্য। সবই পাইবে মহাতাপের ছেলে মানিক। মানিকের যে ভাইয়েরা ইহার পর আসিবে তাহারা। চাঁপাডাঙার বউ ছাড়া অন্য কেহ হইলে সে এতদিন বংশরক্ষার জন্য আবার বিবাহ করিত। কিন্তু সেতাব তাহা করে নাই। তুমি সেটা মান না! ঘোঁতনকে পাওনা ছাড়িতে হইবে। রামকেষ্ট শিবকেষ্টদের জমি কিনিতে সে পাইবে না। তোমার কথায়? প্রতাপ মোড়ল মারা গেলে সম্পত্তি নীলামে উঠিয়াছিল—রামকেষ্ট শিবকেষ্টর বাপ হরেকেষ্ট মণ্ডল চাদর গায়ে দিয়া চটি পায়ে দিয়া সদরে গিয়া প্রতাপ মোড়লের খিড়কি পুকুরের অংশ কিনিয়াছিল। এখনও তাহারা সে পুকুরের অংশীদার। তোমার কথায় তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে! তুমি সেতাবকে ধর্ম অধর্ম শিখাইতে আসিয়াছ। রাগে তাহার চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বাহিরে আসিয়া গোয়াল-বাড়িতে দাঁড়াইল। ডাকিল, গোবিন্দে, গোবিন্দে! ওরে অ-গোবিন্দে! গোবিন্দে!

গোয়ালঘর হইতে গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিল—কি বলছেন গো?

সে চোখ কচলাইতে লাগিল।

—ঘুমুচ্ছিলি?

—ঘুমুই নাই। বসে বসে ঢুলছিলাম।

—ঢুলছিলি?

—কি করব? বড় মনিব্যান না এলে তো দুধ দোয়ানো হবে না।

—তু এক কাজ কর। ছুটে যাবি রামকেষ্টদের বাড়ি, বুঝলি?

ঘাড় নাড়িয়া গোবিন্দ বলিল, হ্যাঁ।

—রামকেষ্টদের দুই কাকীকে জানিস তো?

—এই তো খানিক আগে এয়েছিল, তারাই?

—হ্যাঁ। তাদের যাকে পাবি ডাকবি, আড়ালে ডাকবি, বলবি—কেউ যেন না শোনে, বুঝলি?

—হ্যাঁ, চুপিচুপি বলব।

—হ্যাঁ। বলবি—বড় মুনিব বলে দিলে, তোমরা জমি চাইবে। বাস্, বলে চলে আসবি।

বলিয়াই আপন মনে বলিল, তারপর আমি দেখছি। আমি কারুর কথা শুনি না। কাউকে গেরাহ্য করি না। বড় সব বাড় বেড়ে গিয়েছে।

বলিতে বলিতে গোয়াল-বাড়ি হইতেও বাহির হইয়া গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের পঞ্চায়েত মজলিসে সেতাব আসিল সকলের শেষে। মজলিসের সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রায় দশ-বারো জন লোক বসিয়া আছে। পঞ্চায়েতের প্রধান মোটা মোড়ল বিপিন মণ্ডল স্থূলকায় মানুষ, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক। শান্তদর্শন লোকটি। তাহার আশেপাশে বাকি লোক বসিয়া আছে। রামকেষ্ট ও শিবকেষ্ট দুই ভাই দুই বিপরীত দিকে বসিয়াছে। একটু দূরে বসিয়া আছে তাহাদের দুই বিধবা খুড়ী। মাঝখানে একটা হারিকেন জ্বলিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পথের উপরে জন চার-পাঁচ ছোকরা অন্ধকারের মধ্যে বিড়ি টানিতেছে। একজন বলিতেছিল, জমি তো মোট তিরিশ বিঘে। তাতে খুড়ীদিকে জমি দিতে গেলে ওদের থাকবে কি? অন্য একজন বলিল, ওরা ধরেছে, জমিই ওরা নেবে। সংসারে থাকা মানে অধীন হয়ে থাকা। সে ওরা থাকবে না।

—তা বললে চলবে কেন? ওদের দু ভায়ের কথা ভাবতে হবে তো!

—পঞ্চায়েত কি বলছে?

—মোটা মোড়ল 'না' বলেছে। আর সবাই চুপ করেই আছে। সেতাব পাকু না এলে মুখ খুলবে না।

ঠিক এই সময়েই পিছনে শোনা গেল গলাঝাড়ার শব্দ। একজন বলিল, কে?

পথের বাঁক হইতে লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিল সেতাব।

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। একজন বলিল, সেতাবদাদা!

সেতাব বলিল, আর সেতাবদাদাতে কাজ নাই। পথ ছাড়।

একজন হাসিয়া বলিল, কি হল, মেজাজ এত খারাপ কেন?

সেতাব তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের তালগাছের টুকরা দিয়া গড়া সিঁড়িতে পা দিয়া বলিল, সেতাব কারু কথা গেরাহ্য করে না, বুঝেছ? সে পেকো চামদড়ি কৃপণ—যা বল। ন্যায্য কথা সেতাব বলবেই, আর ন্যায্য দাবি পাওনা সে কড়াক্রান্তি কাউকে ছাড়বে না।

সে গটগট করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মেজাজটা সত্যই তাহার খারাপ হইয়া আছে।

মহাতাপ সন্ধ্যার সময় কাঁধে খোল লইয়া সংকীর্তনের দলে যোগ দিতে যাইবার পথে বাড়ির দুয়ারে প্রকাণ্ড একটা গোখুরা সাপ মারিয়াছে। বৈশাখ মাস, গোখুরা সাপকে পিতিপুরুষে ব্রাহ্মণ বলিত, তাহার উপর অনেক সাপ বাড়ির লক্ষ্মীর প্রহরী। সাপটা বাহির দরজার পাশ দিয়া যাইতেছিল। মহাতাপ একে মহাতাপ, তাহার উপর বৈকালে ভাঙ খাইয়াছে। সাপটাকে দেখিবামাত্র খোল নামাইয়া খামারের একটা বাঁশ লইয়া দুমদাম শব্দে দুই

তিনটা আঘাতেই শেষ করিয়াছে। তিরস্কার করিলে বলিয়াছে—হুঁ, সাপ যদি লক্ষ্মীর পাহারা হয় তো মহাতাপও দিগগজ পণ্ডিত!

তারপর দুই হাতের বুড়া আঙুল নাড়িয়া বলিয়াছে—কচু জান তুমি! এ বাড়ির লক্ষ্মীর পাহারা সাপ নেহি হ্যায় মহাতাপ হ্যায়। এ বাড়ির লক্ষ্মী হল বড়াবউ, আউর মহাতাপ মণ্ডল পাহারাদার!

সাপটাকে দেখাইয়া বলিয়াছে, ও বেটা লক্ষ্মীকে ডংশাতে এসেছিল। এখুনি বড় বউ আসত সন্ধ্যেতে বার দোরে জল দিতে! বাস্। ফোঁস। না-না। করে লাগাত ছোবল!

বলিয়াই খোল লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

তাহার উপর পঞ্চায়েত আসরে আসিবার জন্য লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পা-টি সবে বাড়াইয়াছে অমনি আদরিণী বড় বউ টুক করিয়া পিছু ডাক দিয়াছে। সে ডাকার কত ঢং!

—পিছু ডাকছি না। কিন্তু মনে করিয়ে দিচ্ছি আমার মাথার দিব্যি রইল!

সেতাব চমকিয়া উঠিয়াছিল। ভুরু কুঁচকাইয়া বলিয়াছিল—মানে?

হাসিয়া কাদু বলিয়াছিল—ওর আবার মানে থাকে নাকি? মাথার দিব্যি মানে মাথার দিব্যি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের জন্যে?

কাদু উত্তর দিয়াছে—সত্যি যদি আমাকে ভালবাস তো কিসের জন্যে তা পঞ্চায়েতের আসরে যেতে যেতে ঠিক মনে পড়বে।

সেতাব চটিয়া উঠিয়াছিল—হেঁয়ালী সে ভালও বাসে না, বুঝিতেও পারে না। অথচ ওই কাদুর অভ্যাস। কাদুর স্পর্ধা একেবারে আকাশে ঠেকিয়াছে। গাঁয়ের অনেক মেয়ে আড়ালে আড়ালে বলে—মোড়লবাড়ির চাঁপাডাঙার বউ অহঙ্কারে যেন মটমট করছে। হেসে ঠেকার দিয়ে কথা কয় যেন বিন্দাবনের রাধা! সেতাবের মনে হইয়াছিল তাহারা মিথ্যা বলে না। সে উত্তরে বলিয়াছে—ভাল আমি কাউকে বাসি না; হ্যাঁ।

শুনিয়া কাদুর সে কি হাসি।—বেশ আর একবার বল—তিন সত্যি হোক।

—ক্যানে, মিছেমিছি তিন সত্যি করব ক্যানে? কি দায় পড়েছে!

সারাটা পথ সেতাব আপন মনে গজগজ করিতে করিতে আসিতেছে!

মজলিসের প্রান্তে গিয়া লণ্ঠন রাখিয়া প্রণাম করিল। তারপর মজলিসে গিয়া বসিল। বিপিন তাহাকে দেখিয়াই বলিল, এস বাবা। তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি। নাও, তামাক খাও। হুঁকাটা সে আর একজনকে দিল। সে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি। সে সেতাবের দিকে আগাইয়া দিল। সেতাব হুঁকোটা লইয়া মজলিস হইতে সরিয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া টানিতে বসিল। টানিতে টানিতে বলিল, তারপব? কি ঠিক হল সব?

বিপিন বলিল, এ দিকে তো গোল কিছু নাই! জমি মাপজোক, হিসেবকিতেব সে সব তো হয়েই আছে একরকম! রামকেষ্ট শিবকেষ্ট, আপন আপন পছন্দ করেও নিয়েছে! বাসনকোসন ভাগ কাল সকালে হবে। এখন দুই খুড়া বলছে—আমাদের খাবার মত জমি বার করে দাও।

শিবকেষ্ট বলিল, খেতে দিতে আমরা নারাজ নই। কিন্তু জমি দিতে গেলে আমাদের থাকবে কি?

এক খুড়ী বলিল, তা বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি বউদের সঙ্গে আমাদের যদি না বনে?

বিপিন বলিল, ও কথা অনেক হল বউমা। আর থাক্। আমার বাপু জমি দেবার মত নাই।

যে মাতব্বর হুঁকাটা লইয়া সেতাবকে দিয়াছিল সে বলিল, আমি বলি কি, একটা ধান বরাদ্দ করে দেওয়া হোক, দুজনে দুই খুড়ীকে দেবে। আর দুই খুড়ীর থাকবার মত দুখানা ঘর, রান্নাঘর।

বিপিন বলিল, তা মন্দ কথা নয়। সেতাব, বল বাবা, কি বলছ?

সেতাব হুঁকাটা লইয়া মজলিসের মধ্যে ফিরিয়া বলিল, লেন, খান। বিপিন হুঁকাটা লইল। সেতাব বলিল, আপনাদের উপর আমার কথা বলা ঠিক নয় জেঠা। তবু না বললেও নয়।

একজন বিধবা বলিল, বল বাবা, তুমি হক কথা বল।

—হক কথাই বলব, যেন রাগ-টাগ কেউ করবেন না। ধান ঘর এসব আমার মত নাই। দেখুন, দু বছর পর যদি ধান বন্ধ করে, কি কোন বছর যদি ভাল ফসল না হয়? দিতে না পারে?

বিধবা টিকুরীর খুড়ী বলিল, এই। বুদ্ধিগুণেই হা-ভাত, বুদ্ধিগুণেই খা-ভাত। পঞ্চায়েত বুঝে দেখুক!

ইন্দাশের খুড়ী সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরিল, তার চেয়ে আমাদের দু জাকে পাঁচ বিঘে করে দশ বিঘে জমি আলাদা করে দাও বাবা, আমরাও নিশ্চিন্দি তোমরাও নিশ্চিন্দি। সাতখানা খাটের দড়িতে থাকব না।

উঁহু-উঁহু।—সেতাব ঘাড় নাড়িল।—সাতখানা খাটের দড়িতে থাকব না বললে কি হয় খুড়ী? তোমাদের মুখে আগুন দেবে ওরা, তোমাদের মুখে জল দেবে, শ্রাদ্ধ করবে ওরা। বুড়ো বয়সে অসুখ করলে ওদেরই তোমাদের সেবা করতে হবে। তোমাদের শ্বশুর-স্বামীর বংশ! ভাসুরের ছেলে, স্বামীর ভাইপো। তোমাদের গর্ভের সন্তান নাই; ওরাই তোমাদের সন্তান। আমি বলি, জমি দেওয়াও নয়, ধান দেওয়াও নয়, দুই খুড়ী দুই ভাসুরপোর ঘরে মায়ের মতন থাকবে, তেমনি যত্ন-আত্যি করবে, নাতি-নাতনী নিয়ে ঘর করবে, এরা সেবা করবে, ছেদ্দা-ভক্তি করবে, বাস।

বিপিন বলিয়া উঠিল, ভাল ভাল ভাল। এর চেয়ে আর ভাল কথা হতে পারে না। গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরিবোল হরিবোল!

সেতাব বলিল, পৃথক হলেই পৃথক। মা বেটায় পৃথক হলে মা বেটা পর হয়। আবার পরকে আপন করলে পরই আপন হয়। শিবকেষ্ট রামকেষ্ট পৃথক হচ্ছে, কেন হচ্ছে জানি না। তা হচ্ছে হোক। কিন্তু তোমরা খুড়ীরা দু ভাগকে চার ভাগ করে সংসারটার সর্বনাশ করে দিয়ো না।

অন্য একজন বলিল, বাস্ বাস্। এর ওপর আর কথা নাই। হরিবোল হরিবোল!

আর একজন বলিয়া উঠিল, তাই বটে। হরিবোল হরিবোল!

মজলিসের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল।

ওদিকে ঠিক এই সময়ে বাহিরের রাস্তা হইতে কোন একজনের চীৎকার শোনা গেল—বিচার করুক পঞ্চায়েত, এর বিচার করুক। গরীব বলে আমার মান-ইজ্জত নাই? পঞ্চায়েত—

বলিতে বলিতেই গায়ের চাদরখানা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল রাখাল পাল। বিশ্বামিত্রের মত ক্রোধী শীর্ণকায় রাখাল আসিয়া বসিয়াই মাটিতে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, পঞ্চায়েত এর বিচার করুক। মজলিসটা স্তব্ধ হইয়া গেল।

সেতাব বলিল, কিসের বিচার রে বাপু? হঠাৎ যে একবারে গগন ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলি!

রাখাল বলিল, চেঁচাবে না? আলবত চেঁচাবে। পঞ্চায়েত বিচার করবে কি না তাই বলুক!

বিপিন মোড়ল এবার বলিল, কি হল তাই বল?

—আমাকে মারলে। ঠাস করে এক চড়! এই গালটা দেখ, পাঁচটা আঙুলের দাগ বসেছে!

সে লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া নিজের গালের পাশে ধরিল।

—আঃ তাই তো রে; কে মারলে?

—ওই ওরই ভাই। সে আঙুল দিয়া সেতাবকে দেখাইয়া দিল।

মহাতাপ?—সেতাব প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

সেতাব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, কি বিপদ হয়েছে যে আমার!

বিপিন প্রশ্ন করিল, এমনি মারলে তোকে মহাতাপ? মহাতাপ রাগী বটে, খানিকটা অবোধও বটে, কিন্তু এমনি কেন তোকে মারবে রাখাল?

—নাম সংকেত্তনের দলে আমি বাজাচ্ছিলাম। রাখাল পালের সঙ্গে খোলে কে হাত দিতে পারে বলুক পঞ্চায়েত। আমি হাঁক মেরে বলছি, পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তা বলুক।

—নাই। তাই হল। সে কথা থাক। কি হল তাই বল।

রাখাল বলিল, তাই হল লয়। ডাক কে আছে? ডাক। একটু চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি কেহ তাহার এই আত্মশ্লাঘার উত্তরে সাড়া দেয় কিনা দেখিবার জন্যই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমাকে বলে, তাল কাটছে! নিজে ভাঙ খেয়ে তাল কাটছে। তার ঠিক নাই। আমি বললাম, তোর কাটছে। তা গায়ের জোরে বলে, না, তোর। আমি বললাম, মহাতাপ, ক্ষ্যাপামি করিস তোর বউয়ের কাছে বউদির কাছে, এখানে করিস না। এই আমার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।

বিপিন বলিল, তুই বউ বউদির কথা তুললি কেন?

—কি, হয়েছে কি? বলি তাতে কি হয়েছে কি? তোমরা বিচার করবে কি না বল?

সেতাব বলিল, হবে, বিচার হবে। নিশ্চয় হবে। বস তুই। আগে এই কাজ শেষ হোক। তারপর হবে।

—তারপর হবে?

—হ্যাঁ। বস তুই।

—বসব? বসতে হবে?

—হ্যাঁ রে, তামাক খা।

—নেহি মাংতা হ্যায়। চাই না বিচার আমি। চাই না।

বলিয়া রাখাল হনহন করিয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে বলিল, বড়লোক কি না? নিজের ভাই কি না? বেমক্কা চড় খেয়ে যদি মরে যেতাম আমি?

বিপিন বলিল, গাঁজা খেয়ে খেয়ে রাখালের মেজাজে আগুন ধরেই আছে! মহাতাপকে একটু সাবধান কোরো সেতাব। ভাঙ খেতে ওকে দিয়ো না।

সেতাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমার হয়েছে মরণ। বুঝলেন! আমার কথা কি শোনে?

—চাঁপাডাঙার বউমাকে বোলো, তাকে খুব মানে শুনেছি!

হঠাৎ সেতাব বলিয়া উঠিল, আমি যাই, হতভাগাকে একবার দেখি—

—বোসো, বোসো। মাথা খারাপ কোরো না। এদের কাজটা সেরে দাও বাবা।

সেতাপ আবার বসিল। বলিল, এর আর মারামারি কি বলুন? দুই খুড়ী দুই ভায়ের ভাগ। কে কাকে নেবে বলুক। খুড়ীরাও বলুক।

যে ব্যক্তি সেতাবকে হুঁকা দিয়াছিল সে বলিল, ছোট খুড়ী ইন্দেশের বউ তো ছোট ভাই রামকেষ্টর সম্পর্কে শাশুড়ী হয়। রামকেষ্টর বউ তো ভাইঝি হয়।

রামকেষ্ট বলিল, তা হোক। ছোট খুড়ীর টান দাদার ছেলেদের ওপর। ভাইঝিকে দশটা কড়া কথা না বলে জল খায় না।

ইন্দেশের বউ বলিয়া উঠিল, আর তোমার বউ মুখে ময়দা লেপে চুপ করে শোনে, না? একেবারে ভালমানুষের পিতিমে! আমাকে বলে না? বলে কি বাবা সকল—তবে ভাইঝির গুণের কথা বলি শোন। লুকিয়ে চাল-ধান বেচে পয়সা করে। আমি বলি, সাজার সংসারে চুরি করিস না। ভাগী ভাঁড়িয়ে খেতে নাই। তাই রাগ বাবা। সেদিন নিজের ছেলেকে একটা বাঁশি কিনে দিলে। তা শিবকেষ্টর ছোট ছেলেটা কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, তা একেও একটা কিনে দে। পয়সা তো সাজার সংসারের পয়সা, মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল। আমি বাবা তাকে একটা বাঁশি কিনে দিয়েছি। হ্যাঁ, তা দিয়েছি। ছেলেটা আমার কাছে থাকতে ভালবাসে। এই রাগ।

সেতাব বলিল, বেশ বেশ। তা হলে ছোট খুড়ী শিবকেষ্টর সংসারেই থাকবে।

—তাই থাকব। সেই ভাল।

—আর মেজ খুড়ী টিকুরীর বউ রামকেষ্টর সংসারে থাকবে। বুঝলে গো খুড়ীরা?

টিকুরীর খুড়ী বলিল, বুঝলাম বাবা, খুব বুঝলাম। এমন বোঝা আর বুঝি নাই কখনও। আঃ মরি মরি মরি!

—তার মানে?

—মানে? তুমি বাবা দুমুখো সাপ। এক মুখে কামড়াও এক মুখে ঝাড়। তাই হল। তোমরা পঞ্চায়েত, যা বলবে তাই হল।

বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সেতাব ডাকিল, খুড়ী! অ খুড়ী!

বিপিন বলিল, উঁহু উঁহু! ডেকো না। যাক। ভাগ করতে গিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না বাবা। থাক। এখন শিবকেষ্ট, রামকেষ্ট, ইন্দেশের বউমা, এই যা হল—তাতে তোমরা মোটামুটি খুশী তো?

শিবকেষ্ট বলিল, আমার আপত্তি নাই।

—রামকেষ্ট?

—আমি মশায় যা করে দেবেন তাতেই রাজী।

ইন্দেশের বউ বলিল, আমি মেনে নিয়েছি বাবা, আমি মেনে নিয়েছি।

সেতাব উঠিল। আমি তাহলে উঠলাম জেঠা।

বিপিন বলিল, তা তোমার সেটা কি করে হবে? ঘোঁতনের সেইটা। ঘোঁতন তো আসে নাই।

সেতাব বলিল, সে—সে আমি ছেড়ে দিলাম। বুঝেছেন? সে ছেড়ে দিয়েছি। মহাতাপ যখন ছেড়ে দিয়েছে, তখন ও-কথা থাক। তবে বলতে চেয়েছিলাম, ঘোঁতন আমাকে আঙুল দেখাবে ক্যানে? বুঝেছেন? আর পাগলকে শিব সাজাবার লোভ দেখিয়ে দশ টাকা চাঁদাই বা নিয়েছে ক্যানে? তারই জন্যে। বলুন না দশজনে এ জোচ্চুরি কিনা! আচ্ছা, আমি চললাম জ্যাঠা।

সে বাহিরে আসিয়া আবার একটি প্রণাম করিয়া লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেতাব বাড়ির দরজায় আসিয়াই চাঁপাডাঙার বউয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। বাড়ির ভিতরে চাঁপাডাঙার বউ কাহাকে তিরস্কার করিতেছে।

—তোমাদের দু ভায়ের জালায় হাড়ে কালি পড়ে গেল। নিন্দে শুনে কান পচে গেল।

সেতাব দরজা খুলিয়া গোয়াল-বাড়িতে প্রবেশ করিল, তাহার পর খামার-বাড়িতে ঢুকিল। এবার মহাতাপের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলিল, আমি তোমাকে জালাব? আমি তোমার হাড়ে কালি পড়ালাম?

—পড়াও না ?

—কক্ষনও না। সে পড়ায় তোমার স্বামী—কুচুটে পাকাটি চামদড়ি কেপন—

—ছি ছি মহাতাপ !

—আর ওই ছোট বউ। ওই কুঁদুলী, ওই ঘ্যানঘেনানী, ওই দুষ্ট সরস্বতী।

মানদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও মা গ—অ! বলে সেই দরবারে হেরে বউকে মারে ধরে। আমাকে নিয়ে পড়লে কেন ?

সেতাব বাড়ি ঢুকিয়াই আলোটি কমাইয়া দিয়া খামার-বাড়িতে চুপ করিয়া বসিল।

বাড়ির ভিতরে তখন মানদা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, খবরদার বলছি, আমাকে নিয়ে কথা বলবে না বলছি !

চাপাডাঙার বউ বলিল, মানু, তুই চুপ কর।

—কেন ? চুপ করবে কেন ? আমাকে নিয়ে পড়ল কেন ?

মহাতাপ বলিল, পড়বে না ? তুই তো আজ আমাকে ভাঙ খাওয়ালি। তুই কিনে আনিয়ে বেটে সরবত করে রাখিস নি ? বললি না, বলুক বড়গিন্নি ; সারাদিন ভূতের মত খাটো, বরাবরের অভ্যেস না খেলে বাঁচবে কেন ? ভাঙ খেলে আমার চড়াত করে রাগ হয়ে যায়। দিলাম চড়িয়ে রাখালের গালে।

—এখন রাখালের বউ গাল পাড়ছে শোন গিয়ে। যত শাপশাপান্ত একরত্তি মানিকের ওপর। কেন তুমি এমন করে মেরে আসবে ?

—নিজে তাল কেটে আমাকে তালকানা বলবে কেন ? আমি তালকানা ? ও আমাকে বললে। আমি ছাড়ি না কাটি ?

—হ্যাঁ, তুমিই তালকানা, তোমারই তাল কেটেছিল, আমি বলছি। নাও, মার আমাকে দেখি !

—বড় বউ! ভাল হবে না বলছি !

—নাও, মার না।

— তুমি ছোট বউ হলে সে দিতাম এতক্ষণ।

মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল, কই, মার না দেখি!

—দেখবি?

বড় বউ দাওয়া হইতে উঠানে নামিল,— কাল সকালে আমি চলে যাব তোমাদের বাড়ি থেকে। তোমাদের দুই ভায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারও হবে। মহাতাপের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমারও হবে। দুই ভাইয়ে যা খুশি করবে। এই রাতদুপুরে দুদিক থেকে দুই ভায়ের ওপর গাল পড়ছে। ওদিকে রামকেষ্টদের বাড়ি থেকে, এদিকে রাখালের বউ। আমি আর পারব না, আমি আর পারব না।

বলিয়া চাঁপাডাঙার বউ ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মানদা বলিল, নাও, হল তো! গোসাঘরে খিল পড়ল তো! আর খাবেও না, সাড়াও দেবে না, কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

সেতাব এবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল; সে আর থাকিতে পারে নাই। সে বলিতে বলিতেই ঢুকিল, একে বলে, এ তো বড় ফেসাদ! একে বলে, ঘোরালে লাঠি, ফেরালে কোঁতকা—সেই বিত্তান্ত! আরে বাপু, আমার অন্যায়টা কি হল? তুমি যা বললে, তাই করে এলাম। জমি ধান সব দেওয়া বাতিল করে দুই বউকে দুই ভায়ের ভাগে ভাগ করে দিলাম। তাতেই গাল দিচ্ছে টিকুরীর খুড়ী। রামকেষ্টরা নয়। তা আমি কি করব? ঘোঁতনার ওপব নালিশ তুলে নিলাম—

মহাতাপ উঠানে ভাম হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হোক— চললাম আমি।

সেতাব ব্যস্ত হইয়া বলিল, অই—অই—ওরে, চললি কোথা? ওরে! অঃ, এ গোঁয়ার গোবিন্দকে নিয়ে কি করি বল তো? ওরে! সেতাবও বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইতে মহাতাপ বলিল, সেই রাখলার কাছে চললাম। তার পায়ে ধরে নাকে খত দিয়ে নাকের চামড়া তুলে দিয়ে আসছি।

মানদা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, দিদি! দিদি! শুনছ?

বড় বউ আবার বাহির হইয়া আসিল।

মান্থ বলিল, ওই আবার গেল, বারণ কর।

---না। যাক। রাখাল প্রবীণ মানুষ, গাঁজা খায়; কিন্তু কখনও কারুব মন্দ করে না। ধার্মিক লোক। তার কাছে মাপ চেয়ে আসুক। রাখালের বউয়ের শাপশাপান্ত আমি আর শুনতে পারছি না!

মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল- আব টিকুরীর খুড়ীর শাপশাপান্ত? বড় মোড়লকে পাঠাও পায়ে ধরতে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বড় মোড়ল ন্যায়বিচার করে এসেছে মান্থ। অন্যায় তো করে নি। টিকুরীর খুড়ীই অন্যায় করে শাপান্ত করছে। সেই শাপান্ত আমাদিগকে লাগবে না। আর সে গাল তো দিচ্ছে বড় মোড়লকে আমাকে। তা দিক, মানিকের অকল্যাণ না হলেই হল।

শিবকেষ্ট রামকেষ্ট পালদের বাড়ির একাংশে পথের ধারে দাওয়ার উপর বসিয়া টিকুরীর বউ উচ্চকণ্ঠে গাল দিতেছিল। কিছুদূরে শিবকেষ্ট রামকেষ্ট দাঁড়াইয়া আছে। আর কয়েকজন জুটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঘোঁতন রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া জটলা করিয়া বিড়ি টানিতেছে।

পল্লীগ্রামের সেই ছড়ার মত বাঁধা গালি-গালাজ—অভিসম্পাত। তাহার বাঁধুনি বিচিত্র, স্বর বিচিত্র!

টিকুরীর বউ বলিতেছিল, সব্বস্বান্ত হবে, পথে দাঁড়াবে, ফকির হবে, জমিদার-মহাজনে ডুগডুগি বাজিয়ে যথাসব্বস্ব নীলেম করে নেবে। টিনের চাল ঝড়ে উড়ে যাবে, পাকা মেঝে ফেটে চৌচির হবে। সাপখোপের আড়ত হবে। অকালে মরবেন, অকালে মরবেন, বিনা রোগে ধড়ফড়িয়ে যাবেন--ওই আহুরী গিদেরী পরিবার চাঁপাডাঙার বউয়ের দশা আমার মত হবেন।

ওপাশ থেকে ঘোঁতন বলিয়া উঠিল, তা হবে না খুড়ী, তা হবে না। ও শাপ দিও না। ফলবে না, ফলবে না।

টিকুরীর বউ ফোঁস করিয়া উঠিল—কে রে, বলি তুই কে রে মুখপোড়া ত্যাদড়? তুই কে?

ঘোঁতন হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাঁড়াইল।—মুখখানা আমার কালো বটে খুড়ী, কিন্তু পোড়ে নাই ; মেচেতা পড়েছে। আমি ঘোঁতন।

—ও। ইংরেজী-পড়া বাবু, 'যাত্রার দলের কাপ। তা তুই তো বলবিই রে! তোকে ধান ছেড়ে দিয়েছে, নালিশ তুলে নিলে।

—নিলে সাধে! আমি ঘোঁতন ঘোষ। হোৎ-তা-তা লাঙল-ঠেঙানো বুদ্ধি নয় আমার। আমি কলকাঠি টিপতে জানি। পাঁকাল মাছের পেটে কেঁচোর বাসার খবর জানি আমি। বুঝেছ! আমার নামে নালিশ করবে?

—তুই আমার হয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিতে পারিস? পাঁপরের দরখাস্ত না-কি বলে। টাকাকড়ি লাগে না, অনাথ গরীব বলে।

—বললেই পারি। ঘোঁতন কাউকে ডরায় না।

—তা হলে বোস্। আমি গালটা দিয়ে নিই। মনের ঝালটা মিটিয়ে নিই।

—তা লাও। ওদিকে রাখালের বউও খুব জুড়েছে—ওলাউঠো হবে, না হয়তো রাজকাশ হবে। লোহার গতর ভেঙে যাবে! ছেলে মরবে। বউ ভিক্ষে করবে—

স্বর ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে টিকুরীর বউ শুরু করিল, করবে, ভিক্ষে করবে, দোরে দোরে হরিবোল বলে ওই চাঁপাডাঙার বউ—

হঠাৎ চমকিয়া টিকুরীর বউ বলিল, কে র‍্যা?

অন্ধকার পথে একটা ডুনী মাথায় করিয়া যাইতেছিল নোটন।

—আমি গো, নোটন।

—নোটনা! তা মাথায় কি? ডুনী নাকি? এত রেতে ডুনী নিয়ে কি করবি?

—হ্যাঁ গো। আকের জমিতে ছেঁচন দিতে হবে।

শিবকেষ্ট বলিল—চুপ কর খুড়ী। সেতাবদের কৃষেণ নোটন—ও সব শুনে গেল। বলবে তো গিয়ে সব মুনিব-বাড়িতে।

দুই হাতের বুড়া আঙুল নাড়িয়া খুড়ী বলিল—বয়েই গেল—বয়েই গেল। আমার কেগুনবাড়ি ভেসে গেল! শুনবে! শোনবার জন্যেই তো বলছি! আমি কি ভয় করি নাকি কাউকে।

তখন সেতাবের বাড়িতে দাওয়ার উপর পিঁড়িতে বসিয়া রাখাল ভাত খাইতেছে। সঙ্গে বসিয়াছে—মহাতাপ ও সেতাব। পরিবেশন করিতেছে চাঁপাডাঙার বউ। সে অম্বল পরিবেশন করিতেছিল। সকলেই তালুতে টোকা মারিয়া খাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিল, আঃ!

রাখাল বলিল, আর একটু দাও বউমা, আর একটু! বেরে রেঁধেছ! খাসা হয়েছে!

সেতাব বলিল, তা হলে কি হবে! কাঁচা তেলের গন্ধ উঠেছে। এত করে নাকি তেল দেয়! হুঃ?

মহাতাপ বলিল, তেল বেশি হয়েছে, তেল বেশি হয়েছে! তেল নইলে রান্না হয় নাকি?

রাখাল বলিল, আরে, ওই তেলেই তো অম্বলের সৌরভ···সুবাস! নেশার মুখে যা লাগছে, সে কি বলব, অমৃত যেন। আর তেমনি কি রান্নার তাক। বেঁচে থাক মা সুখে থাক, সংসারের কল্যাণ হোক। খেয়ে মুখটা জুড়ল। পোড়া আর ধরা আসেদ্ধ আর নুনচড়া খেয়ে জিভে যেন চটা ধরেছিল!

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, সব আমাদের ছোট বউয়ের রান্না।

—বা-বা-বা! বলিহারি বলিহারি! তা হবে না কেনে? মহাতাপ যে ছোকরা বড় ভাল, বড় ভাল ছোকরা! আমাকে চড় মেরেছে ভাঙের নেশার মুখে। তা মারুক। ভুল করেছে। আবার গিয়ে তো বললে—রাখালদাদা, দোষ হয়েছে। তা আমিও বললাম, বাস্ বাস্; ঠিক আছে। ভাগ্যে পঞ্চায়েতে নালিশ করি নাই! বুয়েচ, হাতের তীর ছাড়তে নাই। ছাড়লেই বাস্, গিয়ে ভ্যাঁক করে বিঁধে যাবে। তাই তো আমার পরিবারকে তখন থেকে বলছি—এমন করে গাল দিস না, দিস না। তা বুয়েচ, আমাকে মানুষ বলেই গণ্যি নাই। তোমরা কিছু মনে কোরো না—ওর কথায় কিছু হয় না। বুয়েচ? তা সেও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। মহাতাপ বললে, খেতে হবে, আজই রেতে। তা আমি দোনোমনো করছিলাম, কিন্তু সেই বললে—সে কি, ডাকছে হাত ধরে, যাবে না কি? বুয়েচ! তা পেট খুব ভরল। খুব।

মানদা আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল।

—আবার কি?

—দুধ।

এমন সময় বাহিরে ধম করিয়া একটা শব্দ উঠিল। সকলেই চকিত হইয়া উঠিল। মহাতাপ খাবার ছাড়িয়া উঠিয়া লাফাইয়া নামিল।

—কে?

ওপাশ হইতে সাড়া আসিল, আমি গো ছোট মুনিব।

মহাতাপ বাহির হইয়া গেল।

খামার-বাড়িতে নোটন তুনীটা সশব্দে ফেলিয়াছে, শব্দটা তাহারই।

মহাতাপ বলিল—তুনী আনলি?

—না আনলে? তোমার মন তো বিন্দাবন, যদি বাঁশি বাজে তো রেতেই বলবে—চল্ যাব, লাগাব তুনী! তোমার কিলকে বড ভয়!

—দাঁড়া রে বাবা, খোল কুটে রেখেছে কি না দেখি।

—সে বড় মোল্যান ঠিক রেখেছে। কাজে তার ভুল হবে না।

—আরে খোল তো এসেছে কাল বিকেলে! আজ কুটলে কখন? বড বউ—অ বড বউ?

ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে ঢুকিল। তখন সেতাব-রাখালের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহারা হাত মুছিতেছে।

রাখাল বলিতেছে, তা তুমি পালদের বাড়িটা ভাগ করে ভাল করেছ সেতাব। ঠিক করেছ। বউ দুজনাকে ভাগ করে দুজনার ঘরে দিয়েছ, ন্যায্য করেছ। হুঁ! তা নইলে জমি দিলে বেচে-খুচে পালাত। বেশ করেছ। তা হলে আমি যাই। বুয়েচ? আর ওই আমার পরিবারের গালের জন্যে কিছু মনে কোরো না। আমি ঠাণ্ডা, সেও ঠাণ্ডা। বুয়েচ? আমি চললাম। সে আসবে, কাল মহাতাপের বউ-ছেলেকে আশীর্বাদ করতে আসবে। বুয়েচ! বলিয়া পুলকিত হাস্যে স্মিতানন হইয়া উঠিল।

সে চলিয়া গেল। ওদিক হইতে আসিয়া মহাতাপ ঘরে ঢুকিল।

মহাতাপ হাঁকিয়া বলিল, বলি কানমে কেতনা ভরি সোনা পিধা হ্যায় বড় মোলান ? বলি, আকের গোড়ায় দেবার খোল কাটা হয়েছে ?

মানদা বলিয়া উঠিল, বিত্যেব্ দেখ ! ষাঁড়ের মত চেঁচানি দেখ !

কথাটা অবশ্য সে চাপা গলাতেই বলিল, কারণ ভাসুর রহিয়াছে। কিন্তু কথাগুলা কাহারও কান এড়াইল না। এড়াইবার জন্য বলেও নাই সে।

মহাতাপ ফাটিয়া পড়িল, অ্যাও ! কিল মেরে দাঁত ভেঙে দোব। সে আগাইয়াও গেল।

বড় বউ বাহিরে ছিল না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাতাপের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, কি হচ্ছে, হচ্ছে কি ?

মহাতাপ থমকিয়া দাড়াইয়া গেল। বড় বউ বলিল—মারবে ! কেন মারবে শুনি ?

মহাতাপ বলিল, তোমাকে নয়। ওই দুষ্ট সরস্বতীকে।

মানদা বলিয়া উঠিল, বটে ! আমি বুঝি বানে ভেসে এসেছি ?

—আরে, তুই আমাকে ষাঁড় বললি কেনে ?

বড় বউ বলিল, তুমি ওকে দুষ্ট সরস্বতী বলবে কেন ? আর ষাঁড় তো ভাল কথা। বাবা শিবের বাহন। মা দুর্গার সিংহ তার কাছে পাবে না।

- আমাকে বোকা বোঝাচ্ছ তুমি !

— না। তাই পারি ? বোসো, ঠাণ্ডা হয়ে বোসো। এখন কি বলছিলে বল ? কানে কত ভরি সোনা পরেছি, না- -কি ?

মানদা বলিয়া উঠিল, শুধাও না, কত ভরি দিয়েছে ?

মহাতাপ বলিল, সে ওই কেপনকে বলবে। কেবল ধান বেচেছে, গুড় বেচেছে আর টাকা করেছে।

সেতাব আর পারিল না। বলিল, তুমি দাতাকর্ণ হয়ে লোককে পাওনা গণ্ডা ছেড়ে দিয়ে আসছ ! এমনি করলে, খাবে—দু হাতের বদলে চার হাতে খাবে।

মহাতাপ উত্তর না পাইয়া হঠাৎ মাটিতে চাপড় মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমার খোল কোটা হয় নাই কেনে ? আমার আকের জমিতে ছেচন দিতে

হবে। তার আগে খোল না দিলে, আবার সেই এক মাস পর ভিন্ন হবে না। কেনে খোল কোটা হয় নাই?

সেতাব বলিল, হবে রে হবে। ব্যস্ত হোস না! দু-তিন দিন দেরি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

কাদম্বিনী বলিল, কাল পরশু দু দিনে আমি কুটিয়ে দোব। তুমি খেপো না। আর ছেঁচন দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি কোরো না। জল নামবে। দু-তিন দিনের মধ্যেই নামবে।

—নামবে। তোমার হুকুমে নামবে। আকাশ খাঁ-খাঁ করছে। জ্বলে গেল সব।

—নামবে। গরম দেখছ না? তারপর ওই দেখ। লণ্ঠনটা হাতে লইয়া সে দেওয়ালের গায়ে আলো ফেলিয়া অন্য হাতের আঙুল দিয়া দেখাইল—মেঝে থেকে পিঁপড়েরা ডিম মুখে করে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

দেখা গেল, সারি বাঁধিয়া লক্ষ পিঁপড়া উপরে উঠিয়া চলিয়াছে।

বড় বউ বলিল, শুধু, এক জায়গায় নয়. আজ আমি পাঁচ-সাত জায়গায় দেখেছি।

—আ—ত তেরি তোম তেরে না। বলিয়া মহাতাপ একটা লাফ দিয়া উঠিল। তারপর বলিল, দাদা, বোসো বোসো। তামুক সাজি।

বলে কলকে লইয়া তামাক সাজিতে বসিল।

বড় বউ ডাকিল, মানু, আয় খেয়ে নিবি।

বড় বউয়ের দেখায় ভুল হয় নাই। রাত্রে সত্য সত্যই জল নামিল। গুরু-গুরু শব্দে মেঘগর্জনে মহাতাপের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

মানু তখন উঠিয়া পড়িয়াছে! সে ঘরের জানালা বন্ধ করিতে ব্যস্ত।

মহাতাপ সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, জল? মেঘ ডাকছে?

মানু বলিল, ছাঁটে সব ভিজে গেল।

মহাতাপ বলিল, যাক যাক। বন্ধ করিস না মানু, বন্ধ করিস না।

—বন্ধ করব না ?

—না। আহা-হা, কেমন জল নেমেছে দেখ দেখি !

উঠিয়া গিয়া মান্থর হাত ধরিল। বলিল, বোস এইখানে। বসে বসে জল দেখি।

মান্থ ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, জল দেখব ?

হ্যাঁ। আমার কোলে মাথা রেখে শো। আমি জল দেখি আর তোকে দেখি। হঠাৎ এই বর্ষার আমেজে তাহার আবেগ-উথলিয়া উঠিল। সে দুই হাতে মান্থর মুখখানি ধরিয়া বলিল, পাগলি পাগলি পাগলি ! তোকে আমি খু-ব ভালবাসি।

—ছাই বাস। দিনরাত--মারব, মারব আর অকথা কুকথা !

—আরে ! সে কথা তোকে না মান্থ, তোকে না। তোর ক্যাটকেঁটে কথাকে—

—হু। বড় মোল্যানের কথাগুলা তো মিষ্টি লাগে ! তার বেলা ?

—আরে বাপরে ! দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া মহাতাপ বলিল, আরে বাপরে, বড়কী বহু, উ তো ঘরকে লছমী হ্যায়।

মহাতাপ মানদাকে সজোরে বুকে চাপিয়া যেন পিষিয়া ফেলিল।

ওদিকে চাঁপাডাঙার বউয়ের ঘরে চাঁপাডাঙার বউ আপন ঘরের জানালায় একা বসিয়া বাহিরের বর্ষণের দিকে চাহিয়া বহিয়াছে।

সেতাব মুড়িসুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। দুর্বলদেহ সেতাবের অল্পেই শীত লাগে। গ্রীষ্মকালেও সে একখানা চাদব পায়েব তলায় রাখিয়া তবে ঘুমায়। চাঁপাডাঙার বউ স্বামীর জড়োসড়ো ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়া চাদরখানা তাহার গায়ে চাপাইয়া দিল। ও ঘরে মানিক কাঁদিয়া উঠিল। চাঁপাডাঙার বউ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে বর্ষা নামিয়া পড়িল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই। কি যে হইয়াছে দিন কালের—সে কথা কৃষিজীবী সাধারণ মানুষগুলি বুঝিতে পারিতেছে না। চিরকালের প্রবাদ—খনার বচন—'চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড়পাথর, জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে—তবে জেনো বর্ষা বটে'। অর্থাৎ চৈত্রে আধা শীত আধা গরম, বৈশাখে কালবৈশাখী, জ্যৈষ্ঠে প্রখর গ্রীষ্ম—এই হইলে জানিবে সুবর্ষা অবশ্যম্ভাবী। আর এ ফাল্গুনের শেষ হইতেই গরম উঠিতেছে; চৈত্রে বৈশাখে মারাত্মক রৌদ্র, কালবৈশাখী নাই! কদাচিৎ এক-আধ পশলা বর্ষা ঝড়; শিলাবৃষ্টি তো নাই। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে হঠাৎ বর্ষার মেঘ গুরু-গুরু ডাকিয়া চালিয়া আসিতেছে। চাষীদের বীজ পাড়া হইতেছে না। বর্ষা তাহাদিগকে বেকুব করিয়া দিয়া বিদ্যুতের মৃদু মৃদু চমকে যেন সকৌতুকে হাসিয়া তামাসা করিতেছে। মহাতাপ বর্ষার মেঘকে নিত্য গালি পাড়ে। সে বিপুল বিক্রমে মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। শুকনা ধূলার বাতে বীজ পাড়া হইয়াছে সামান্য। বাকি বীজ আছাড়া করিয়া ফেলিতে হইবে। দশ দিনের মধ্যে সে কাজ শেষ করিয়া মহাতাপ জমিতে জল বাঁধিয়া লাঙল চালাইতে লাগিয়াছে। সেতাবও এখন মাঠে। সে কখনও খানিকটা কোদাল চালায়। কখনও এক আধবার লাঙলের মুঠা ধরে। আলের উপর বসিয়া তামাক সাজে, নিজে খায়। মহাতাপকে ডাকিয়া হাতে হুঁকা দিয়া তাহার লাঙলটা গিয়া ধরে।

মহাতাপ বলে—ক্ষ্যাপামি কোরো না। মোষের লেজের বাড়িতে তুমি পড়ে যাবে। মহাতাপ দুইটি বিপুলকায় মহিষ লইয়া লাঙল চালায়।

নোটন কৃষাণ মুখ টিপিয়া হাসে। মিথ্যা বলে নাই ছোট মনিব। বড় মনিব তাহার তালপাতার সেপাই।

সেদিন আষাঢ়ের পনেরোই। গত দুই-তিন দিন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছিল। মাঠ ঘাট প্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। সকালবেলাটাও ঘনঘটা হইয়া রহিয়াছে। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। চাঁপাডাঙার বউ দাওয়ার উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া অলস দৃষ্টিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মানিক একটা বাটিতে মুড়ি খাইতেছে।

মানদা ভিজিতে ভিজিতে এক পাঁজা বাসন লইয়া বাড়িতে ঢুকিল। দুম করিয়া দাওয়ার উপরে রাখিয়া দিয়া আবার প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মানু--

---আসছি।

--যাচ্ছিস কোথা নাচতে নাচতে?

—মাছ।

---মাছ!

--মাছ উঠেছে পুকুর থেকে। ছোট ছোট পোনা।

—পোনা বেরিয়ে যাচ্ছে? গোবিন্দকে পুকুরের মুখে বাঁধ দিতে বল।

-তুমি বল। আমি মাছ ধরে নিয়ে আসি। গোঁ-গোঁ করে নালার জলে ছুটছে সারবন্দী।

সে বাহির হইয়া গেল।

মানিক দাঁড়াইয়া উঠিল—আমি যাব। সে তাহার সাধের বাঁশিটা লইয়া একবার বাজাইয়া দিল—পু!

বড় বউ তাহাকে কোলে লইয়া মাথাল মাথায় দিয়া উঠানে নামিল। নহিলে যে দুরন্ত ছেলে—জলে ভিজিয়া নাচিয়া-কুদিয়া একাকার করিবে। মহাতাপের ছেলে তো! খামার-বাড়িতে আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ! গোবিন্দ!

মানিক বাঁশি বাজাইল—পু-পু। খামারে গোবিন্দ নাই। নিশ্চয় বর্ষার আরামে গোয়ালের দাওয়ায় খড়ের গাদা বিছাইয়া শুইয়া ঘুম দিতেছে। ছোঁড়াটা ইদানীং বড় কাজে ফাঁকি দিতেছে। কোন দিন সন্ধ্যার সময় থাকে

না। সন্ধ্যার আগেই গোরু গোয়ালে ঢুকাইয়া পালায়। তাও দুটা একটা বাছুর বাহিরে ফেলিয়া যায়!

সে গোয়াল-বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল।

গোবিন্দ ঘুমায় নাই। সে গোরুর চালায় দাঁড়াইয়া কোমরে হাত দিয়া নাচ প্র্যাক্‌টিস করিতেছিল। সে ইহারই মধ্যে ঘোঁতনের যাত্রার দলে ভর্তি হইয়াছে। আপন মনেই সে—এক দুই তিন, এক দুই তিন চার গনিয়া গনিয়া নাচিতেছিল।

চাঁপাডাঙার বউ ডাকিল, গোবিন্দে!

তালভঙ্গের অপরাধে অপরাধীর মত গোবিন্দ দাঁড়াইয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, ও কি হচ্ছে? অ্যাঁ?

গোবিন্দ জিভ কাটিয়া মাথা হেঁট করিল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়া দিল—পু।

—বলি ক্ষেপলি নাকি? নাচছিস আপন মনে?

—উ কিছু লয়। কি বলছ? মাথা চুলকাইতে লাগিল।

—কিছু নয়! এক দুই তিন, এক দুই তিন—বলে নাচছিলি আর বলছিস—কিছু নয়?

এবার গোবিন্দ বলিল, নাচ শিখছিলাম গো! যাত্তার দলে সখী সাজব কিনা? লাও, এখন কি বলছ বল!

—যাত্তার দলে সখী সাজবি? তা হলে সে খুব যাত্তার দল।

—উঁহু! ঘোঁতন ঘোষ মশায়ের দল! দেখবে এবার কেমন গায়েন করে! হুঁ।

—ঘোঁতন ঘোষের দলে ঢুকেছিস?

বড় বউ স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ধারণা করিতে চেষ্টা করিল, ব্যাপারটা কি? তাহার যেন একটা সন্দেহ হইল।

রাখালটা অস্বস্তিতে পড়িয়াছিল। সে বলিল. বল, ক্যানে গো!

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, শাওন মাস থেকে তোর জবাব হল গোবিন্দে। তোকে আর কাজ করতে হবে না। মাসের শেষে মাইনে—। বলিয়াই

মনে হইল—গোবিন্দ মাইনে পাইবে না। পূজা পর্যন্ত তাহার মাহিনা সে অগ্রিম লইয়া রাখিয়াছে। আবার একবার তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—এইজন্যেই তুই সন্ধ্যের আগে পালাস? আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ঘোঁতন তোকে আমাদের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে না গোবিন্দে? কি জিজ্ঞাসা করে?

গোবিন্দ কিছু বলিবার পূর্বেই ছোট বউ এক আঁচল মাছ লইয়া প্রবেশ করিল! —অ দিদি। পাডার ছেলে জুটে সব ধরে নিলে মাছগুলো। খলবল করে বেড়াচ্ছে—এক শো, দু শো—

—করুক। তুই তো নেচেকুঁদে এলি জলে কাদায়!

—এই দেখ কত মাছ ধরেছি!

আঁচল খুলিয়া সে ঝরঝর করিয়া মাছগুলা ফেলিয়া দিল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়া ছিল। নেহাত ছোট মাছ নয়, গত বছরের পোনা—কোনটা একপোয়া কোনটা তিনছটাক। কাতলাগুলা পাঁচ পোয়া হইয়াছে।

চাঁপাডাঙার বউ ঘোঁতনের কথা বাদ দিয়া গোবিন্দকে বলিল, গোবিন্দ, শিগ্‌গির যা। যতক্ষণ আছিস কাজ করতে হবে তো। যা!

পুকুরটা ভাগের পুকুর। তবে সেতাবদের অংশই বেশি। সেতাব কিনিয়া কিনিয়া অংশটাকে প্রায় দশ আনার কাছাকাছি করিয়া ফেলিয়াছে। পুকুরটা তাহার বাড়ির কাছে, হেফাজত করিতে সেই করে। সেতাবের পর মোটা অংশ বিপিন মোড়লের; প্রায় সোয়া তিন আনা অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। অবশিষ্ট এগার পয়সার মধ্যে ভাগী আছে অনেক কয়জন। রামকেষ্ট এবং শিবকেষ্টর তিন পয়সা রকমের ভাগ আছে। সেটা অবশ্য সেতাবের কাছে ঋণদায়ে আবদ্ধ। শিবকেষ্টর ভাগের খুড়ী টিকুরীর বউ 'মাছ বাহির হইতেছে এবং ছেলের পাল মাছ ধরিতেছে' সংবাদ পাইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া ছেলের দলের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে শুরু করিল।

—বলি অ ড্যাকরারা, অ অল্‌পেয়েরা, অরে অ আবাগেরা, আবাগীর পুতেরা, বলি পরের লুটেপুটে খেয়ে কদিন বাঁচবি রে! ওলাউঠো হয়ে

মরবি রে, ধড়ফড়িয়ে মরবি। পুকুরে শিবকেষ্টর দেড় পয়সা অংশ, আমার দেড় পয়সা ভাগ দিয়ে যা বলছি! বলি পালাচ্ছিস যে! আমি বুঝি দেখতে পাচ্ছি না? আমার চোখ নাই! ঢেলা ছুঁড়ে মারব, ঢেলা ছুঁড়ে মারব বলছি। পরের পুকুরের মাছ বেরিয়েছে—বড় মজা, ভাজা খাবি, ঝোল খাবি, অম্বল খাবি, খাবি খেয়ে মরবি, ওলাউঠো হয়ে মরবি, অম্বলশূল হবে—

কয়েকটা ছেলে পথের ধারের গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া টিকুরীর বউ বলিল, যাবি কোথা? পথ আগলে দাঁড়িয়েছি আমি। দে বলছি আমার ভাগের মাছ, দে।

একটা ছেলে তাহাকে জিভ কাটিয়া ভ্যাঙচাইয়া বলিল, দে! দে বললেই দেবে? মাঠে মাছ ধরেছি; তোমাদের পুকুরের মাছ তা কে বললে? গায়ে নেকা আছে?

—ওরে খালভরা! নেকা নাই, কিন্তু মাছগুলো কি আকাশ থেকে পড়ল?

—তা কি জানি? ওই তো বড় মোড়লদেব মোটা ভাগ, তাদের ছোট বউ তো কিছু বললে না?

আর একটা ছেলে বলিল, সি এক আঁচল ধরে নিয়ে গেল—সের দরুনে।

টিকুরীর বউ এবার জ্বলিয়া উঠিল!—অ্যাঁ? ওরা নিয়ে গেল? যাই, আমি যাই একবার! আগে তোরা মাছ দিয়ে যা। দে—দে—মাছ দে। দে।

হঠাৎ একটা বড় গাছের আড়াল হইতে রাখাল পাল বাহির হইয়া আসিয়া আঁচল হইতে মাছ কয়েকটা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, ওই লে। সে তোর মাছ!

টিকুরীর বউ তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু গাছ-কোমর বাঁধা কাপড় খুলিল না। সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। অ মাগো! এ কে গো? পালেদের ফাকলা?

—ফাকলা! আমার নাম ফাকলা? ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল রাখাল।

—তা ভাসুরের নাম করব নাকি?...তুই যে সম্পর্কে ভাসুর হগ মিন্‌সে। বুড়ো মিন্‌সে ছেলের পালের সঙ্গে মাছ ধরতে এয়েছে। নোলাতে ছেঁকা দাও গিয়ে।

রাখাল মুহূর্তে ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত জবাব দিল—গরম গরম মাছভাজা খেয়ে তুমি নোলাতে ছেঁকা নিয়ো মা, তুমি ছেঁকা নিয়ো। নোলাতে আরও গাল ফুটবে ; তপ্ত খোলায় খইয়ের মত ফুটবে।

হনহন করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে রাখাল আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, মরে তুমি মেছো পেত্নী হবে, মাছ-মাছ করে বিলে বিলে চবাং চবাং করে ঘুরে বেড়াবে, সারা অঙ্গে জোঁক ধরবে। তা আমি বলে দিলাম। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ছেলেগুলা এই অবসরে সুটসুট করিয়া পালাইতেছে। টিকুরীর বউ এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মাথায় সে এতক্ষণে ঘোমটা দিতে পারিয়াছিল এবং রাখাল পালের গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিল, মরে যাও, তুমি মরে যাও, অপঘাতে যাও, মাছ বলে সাপ ধর, সাপের কামড়ে জ্বলে পুড়ে মর। পেরেত হও। আপন জ্বালাতে তুমি দাপাদাপি করে বেড়াও।

মাছ কয়টা কুড়াইতে কিন্তু সে ভুলিল না! মাছ কয়টাই কুড়াইতেছিল। এমন সময় মাঠের খাবার লইয়া বড় বউ বাড়ি হইতে বাহিরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, কি হল গা টিকুরীর খুড়ী?

মাছ কুড়াইতে কুড়াইতেই মুখ তুলিয়া চাঁপাডাঙার বউকে দেখিয়া টিকরীর খুড়ী বলিল, এই যে! মোড়ল-গিন্নী! ভাগিনী আমার!

মাছ কুড়াইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমাদের ছোট বউ নাকি সাজার পুকুরের পাঁচ সের মাছ ধরে ঘরে ঢুকিয়েছে?

চাঁপাডাঙার বউ অবাক হইয়াও হাসিয়া কৌতুকভরে বলিল, পাঁচ সের? দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করলে কে খুড়ী?

—দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করলে কে খুড়ী! ওজন করবে কে? বলি ওজন করবে কে? আমি কি মেছুনী নাকি?

চাঁপাডাঙার বউ এবার বিব্রত হইল, সে জানে ইহার জের অনেক দূর যাইবে। সে তাই বলিল, সে আবার কখন বললাম তোমাকে?

—বললে না? তো কি বললে? ও-কথার মানে কি হয়?

—তা জানি না। ছোট বউ কতকগুলো মাছ ধরে এনেছে। মাঠে

ছড়িয়ে পড়েছিল। সে মাছ ঘরে আছে, তোমার ভাগ তুমি নিয়ে যাও।

—যাবই তো। ভাগের ভাগ হক্কের ধন। এ আমার ভাইকে ফাঁকি দিয়ে পুঁটলি-বাঁধা ধন নয়। নেবই তো ভাগ।

—কি বলছ খুড়ী যা-তা?

—ঠিক বলছি। দেওর-সোহাগী, দেওরকে সোহাগের মানে আমরা বুঝি না, না? কিন্তু ওতে নিজেই ফাঁকি পড়ে, বলি, ঠকিয়ে জমানো ধন ভোগ করবে কে? বলি হল একটা কোলে? ওই জন্যেই ছেলে নেনা যেমন সেতাব—তেমনি তুমি!

এবার চাঁপাডাঙার বউ গম্ভীরস্বরে বলিল, থাম টিকুরীর খুড়ী।

টিকুরীর খুড়ী থামিয়া গেল। চমকাইয়া উঠিয়াই থামিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কণ্ঠস্বরে যেন কি ছিল; সে যেমন অলঙ্ঘনীয়—তেমনি ভৎসনাপূর্ণ।

সেই কণ্ঠস্বরেই চাঁপাডাঙার বউ বলিয়া গেল, তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয় তবে ভগবান আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত করেন। আর যদি মিথ্যা হয় তবে তারও বিচার তিনি করবেন। কোন শাপান্ত আমি করব না।

ফিরিল সে, ফিরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, মানু! মানু!

মানু বাড়ির ভিতর হইতেই সাড়া দিল, কি বলছ?

—এই টিকুরীর খুড়ীকে ওদের মাছের ভাগ দিয়ে দে। যাও খুড়ী, তোমার ভাগ তুমি নাও গে। মানুও সে মূর্তি সেথায় দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কোন একটা কথাও মুখে ফুটিল না। মাছ সে বড় ভালবাসে। সেই মাছ ফেরত দিবার আদেশের বিরুদ্ধেও কোন কথা তাহার ফুটিল না।

কথা কটা বলিয়া চাঁপাডাঙার বউ আবার ফিরিল এবং আপন পথে গরবিনীর মতই চলিয়া গেল।

গ্রাম্যপথে তখন চাষীর ঘরের মেয়েরা স্বামী-পুত্রের বাপ-ভাইয়ের খাবার লইয়া মাঠে চলিয়াছে। কাঁকালে ঝুঁড়ির মধ্যে কাঁসার খোরায় মুড়ি গুড় ইত্যাদি। বৃষ্টিতে যাহাতে সেগুলি ভিজিয়া না যায়, তাহার জন্য তাহার

উপর আর একটা ঝুড়ির আবরণ। এক হাতে জলের ঘটি। তাহারা আগে চলিতেছে। চাঁপাডাঙার বউয়ের আজ দেরি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও সে চলিবার গতি ত্বরিত করিতে পারিতেছে না। তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিতেছে, গা যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। টিকুরীর খুড়ী তাহার বুকে যেন শেল ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। সে আঘাতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সব বল যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। সে গ্রামপ্রান্তের একটা গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর চলিতে পারিবে না।

পিছন হইতে একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চাঁপাডাঙার বউ মাঠের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেদনার্ত অন্তরের সঙ্গে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বোধকরি একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। মন এমন ক্ষেত্রে শূন্য বিস্তৃতির দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পায়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল কাদম্বিনী। এই বিস্তীর্ণ জলভরা মাঠও মাসখানেকের মধ্যে সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিবে। তাহার উঠিবে না!

মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—বড় মোল্যান!

চাঁপাডাঙার বউ মুখ ফিরাইল। ইহারই মধ্যে কখন তাহার চোখ হইতে জলের ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে।

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলিল, কাঁদছ তুমি বড় মোল্যান?

চাঁপাডাঙার বউয়ের খেয়াল হয় নাই যে, তাহার চোখ হইতে জল গড়াইতেছে। কথাটা শুনিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিতে চেষ্টা করিল। দুই হাত আবদ্ধ, কাজেই মুখখানি নিজের কাঁধের কাপড়ে গুঁজিয়া চোখের জল মুছিয়া চাহিল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, কি হল গো মোল্যান?

বিষণ্ণ হাসিয়া চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বড় মাথা ধরেছে মা। শরীরটা কেমন করছে আমার।

সে আবার মুখ ফিরাইল।

সামনেই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। বর্ষণের মধ্যে কর্ষণ চলিয়াছে। মাঠে মাঠে হালগোরু আর মানুষ। চাষীর পেশীসবল দেহ সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে,

গোরুগুলি কাঁধ টান করিয়া লাঙল টানিয়া চলিয়াছে। কতক লোক আলের উপর কোদাল কোপাইয়া চলিয়াছে। বীজক্ষেতের মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বীজচারা তুলিতেছে।

মধ্যে মধ্যে বীজের বোঝা মাথায় করিয়া চাষী চলিয়াছে রোয়ার ক্ষেত্রের দিকে। পরিপাটি কাদা-চাষ-করা-জমিতে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়া ধানচারা রোপণ করিতেছে। চারিদিক ব্যাঙের কোলাহলে মুখর। কাদা-চাষ-করা জমির চার পাশে কাক নামিয়াছে—পোকামাকড়ের আশায়। দুই একটা কাদাখোঁচা এখানে ওখানে ঘুরিতেছে। কালো মেঘের গায়ে সাদা বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে মাঝে মাঝে। মেঘমেদুর দিনটির সঙ্গে ক্লান্ত বিষণ্ণ চাপাডাঙার বউ যেন একাত্মতা অনুভব করিতেছিল।

যে মেয়েটি চাঁপাডাঙার বউয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিল সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, দেহ ভাল নেই তো এই জলে ভিজে এলে ক্যানে মা? ছুটকীকে পাঠালেই হত।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, অমরকুড়ির পানে যাস যদি নয়নের মা, তবে আমাদের ওদিকে ডেকে দিস, বলিস—এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আর যেতে পারছি না।

—দোব—দোব। ছোঁবার তো নয় মা, নইলে আমিই নিয়ে যেতাম।

—তার চেয়ে বড় মোড়লকে বলিস। মহাতাপ চাষ ছেড়ে আসতে রাগ করবে। বড়কে বলিস, সে এসে নিয়ে যাবে।

অমরকুড়ি অর্থাৎ অমরকুণ্ড। ধান সেখানে মরে না। সেখানেই তখন সেতাবদের চাষ চলিতেছিল।

চাষের সময় সেতাবও চাষে খাটে। কঠিন কাজগুলা তেমন সে পারে না, তবে অন্য সকল কাজই করে। কোদাল কোপায়, বীজচারা পোঁতে, কাদা-চাষ-করা জমিতে কোন ঠাঁই উঁচু হইয়া থাকিলে, সেও পায় করিয়া ঠেলিয়া সমান করিয়া দেয়।

সেতাবদের চাষ বড়। দুইখানা হাল। হাল দুইখানার কাজ শেষ হইয়াছে; লাঙল খোলা অবস্থায় হাল কাঁধে লইয়া গোরু চারিটা ঘুরিয়া ঘাস

খাইতেছে। কয়েকজন সাঁওতাল মেয়ে ধান পুঁতিতেছে। মহাতাপ কোদাল কোপাইতেছে। সেতাব হুঁকা হাতে জমির এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ঘুরিয়া উঁচু জায়গাগুলি পায়ে বসাইয়া দিতেছে।

নয়ানের মা জমির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চাঁপাডাঙার বউয়ের দেহ খারাপ, আসিতে পারিবে না শুনিয়া সেতাব উদ্বিগ্ন চিত্তেই আলপথে হাঁটিতেছিল। গাছতলায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, চাঁপাডাঙার বউ চুপ করিয়া যেন মাটির পুতুলের মত বসিয়া আছে।

সেতাব বলিল, নয়ানের মা বললে—দেহ খারাপ তোমার?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলের বাঁধ ভাঙিয়া গেল।

—ওই—ওই, একে বলে, তা হলে জলে ভিজে এলে ক্যানে? ম্যালেরিয়ার সময়—দেখি, কপাল দেখি! সে কপালে হাত দিতে গেল।

চাঁপাডাঙার বউ কপাল সরাইয়া লইয়া বলিল, না।

—এই দেখ, না ক্যানে? দেখি!

—না কিছু হয় নি আমার।

—একে বলে, এ তো ভ্যালা বিপদ রে বাবা!

—লোকের কথা আমি আর সইতে পারছি না।

—এই দেখ। কে আবার কি কথা বললে তোমাকে? কে? কার ঘাড়ে তিনটে মাথা? বল, আমি দেখছি তাকে। মহাতাপকে বললে—

—না, সে শুনবে বলে তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে এখানে এনেছি আমি। লোকে বলছে মহাতাপকে ঠকিয়ে তুমি পুঁজি করছ। কেন তুমি মহাতাপকে সব কথা বল না?

—তোমাকেই বলি না কি আমি?

—তাতে ক্ষেতি হয় না। কিন্তু—

—সে আমি বুঝব; সে আমার মায়ের পেটের ভাই। তাকে বলি—আর সে পাড়াসুদ্ধ গেরামসুদ্ধ বলে বেরাক। কিন্তু কে কি বললে—আমার দিব্যি দিয়ে বলছি বলতে হবে তোমাকে।

—দিব্যি দিলে ?

—দিলাম।

—বললে টিকুরীর খুড়ী।

টিকুরীর খুড়ী তখন সেতাবদের বাড়ির দাওয়াতে বসিয়া মানদার সঙ্গে মাছ ভাগ লইয়া বেশ একটি ঝগড়া পাকাইয়া তুলিয়াছিল। উঠানে মাছ ভাগ করা পড়িয়া আছে। এদিকে অনেকগুলি—সেটা সেতাবদের ভাগ, আর এক জায়গায় বিপিনের অর্থাৎ মোটা মোড়লের ভাগ, সেটা সেতাবের ভাগ হইতে কিছু কম হইলেও নেহাত কম নয়, আর কয়েকটি ভাগে—কোনটিতে দুইটি কোনটিতে তিনটি এমনি। গোবিন্দ মাছ ভাগ করিতেছে।

মানিকের হাতে একটি মাছ। সে মাছটা লইয়া টিপিতেছে।

টিকুরীর খুড়ীর ভাগ ওই তিনটি মাছওয়ালা ভাগের একটা ভাগ। মাছ তিনটি তুলিতে তুলিতে বলিল, ভাগী ভাঁড়িয়ে খেতে নাই বাছা, তাতে মঙ্গল হয় না। বুঝেছ ? খেয়ো না তা। তোমার একটা ছেলে। ভাসুরের কাছে জায়ের কাছে ও বিদ্যা শিখো না। ফল দেখছ তো ? তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে ঠকিয়ে গোপনে পুঁজি অনেক করেছে ওরা। কিন্তু হয়েছে ? বলি একটা সন্তান হয়েছে চাঁপাডাঙার বউয়ের ? মাছসুদ্ধ হাত দুটা সে মানদার মুখের কাছে নাড়িয়া দিল।

মানদা কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, মিছে কথা বলছ কেনে ?

—মিছে কথা। মিছে কথা ! গাঁয়ের লোককে শুধাও গা ! দেওর-সোহাগী আমার ! মরণ তোর দেবীপুরের বউ ! কিছু বুঝিস নে তুই। শোনগে, ঘোঁতন ন্যাকাপড়া-জানা ছেলে—ভদ্দর-নোক—সে কি বলে শোনগে ! বলে দেওর-ভাজ আমরা আর দেখি নাই কখুনও ! নতুন দেখছি ! মর তুই মর ছুঁড়ি ! তুই মর !

সে চলিয়া যাইতেছিল।

গোবিন্দ এবার বলিল, অই, অই, তুমি রাখাল পালের কাছে যে মাছ কটা

নিলে, সে কটা ভাগ কর এইবার। ওগো ও মোল্যান—অই! মানিকের মা, বল না গো। অ ছোট মোল্যান! ওই ওর কোঁচরে ভরা রয়েছে গো।

মানদা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবু সে বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে টিকুরীর খুড়ীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

টিকুরীর খুড়ী কিন্তু মাছগুলি লইয়া শিবকেষ্টর বাড়ি গেল না। এই জলের মধ্যেই সে গিয়া উঠিল ঘোঁতনের বাড়িতে। ঘোঁতন তাহার মামলা করিয়া দিবে বলিয়াছে। সেই জমি ভাগের মামলা।

সেদিন সাবরেজেস্ট্রি আপিস বন্ধ। তাহার উপর বর্ষার দিন। ঘোঁতন দাওয়ার উপর বসিয়া বাঁয়া-তবলা লইয়া পিটিতেছিল। গান তাহার বড় আসে না। তবলাতেই তাহার সঙ্গীত-প্রিয়তার আবেগ নিঃশেষিত হয়। ধা তিন—ধা—ধাতিন ধা। তে রে কেটে—মুখে বোল বলে আর তবলা বাজায়। তবে বক্তৃতায় সে মজবুদ। শকুনি, কলি, তক্ষক প্রভৃতি কয়টা পার্টে তাহার খুব নাম।

খুড়া ঘোঁতনের দাওয়ায় মাছগুলি ঢালিয়া দিয়া বলিল, লে বাবা ঘোঁতন, ভেজে খাস। খুড়ী চাপিয়া বসিল।

ঘোঁতন খুশী হইয়া বাজনা বন্ধ করিয়া বলিল, এযে লহনা পোনা খুড়ী!

—হেঁ বাবা। পেলাম, তা বলি ঘোঁতনকে দিয়ে আসি। তা আমার মামলার কি করলি বাবা?

—করেছি খুড়ী। ঠুকে দিয়েছি দরখাস্ত। লিখে দিয়েছি সেতাব মোড়ল বিপিন মোড়ল গং প্রভৃতি পঞ্চায়েতবর্গ ঘুস খাইয়া বিধবাদের সম্পত্তি ঠকাইয়া শিবকেষ্ট রামকেষ্ট গংকে দিয়াছে। একেবারে ম্যাজি-স্ট্রেটের কাছে! ইংরিজীতে দরখাস্ত লিখে দিয়েছি।

বলিতে বলিতেই হেঁট হইয়া একটা মাছ তুলিয়া লইয়া বলিল, মাছ উঠেছে বুঝি পুকুর থেকে? বেড়ে টাটকা মাছ। ভাজি যা হবে! পুটি, পুটি, অ পুটি!

খুড়ী বলিল, সাজার পুকুরের মাছ, বুয়েচ বাবা, মাঠে একেবারে ছয়লাপ। মহাতাপের বউ সের দরুনে ধরে ঘরে ঢুকিয়েছে। তা যদি বলতে গেলাম

বাবা, তো চাপাডাঙার বউয়ের ঠেকার কি? আমিও টিকুরীর বেটী, আমি খুব শুনিয়ে দিয়েছি। মুখে মুখে বলে দিয়েছি—বলি দেওর-সোহাগী আমার, ঘরের ভাগী ভাড়িয়ে খেয়ে তোমার তো একটা হল না। আবার শেষে পাড়ার সরিকদের ফাঁকি? ওদের ছোট বউকেও বলে এসেছি। গলায় দড়ি তোর। দেওর ভাজ আর পৃথিবীতে নাই? তা কাকে বলছ? ছুঁড়ী ভাবলী।

ঘোঁতন বলিল, তুমিও ভাবলী খুড়ী, তুমিও ভাবলী।

—আমি ভাবলী?

ঠিক এই সময়েই পুটি—ঘোঁতনের অবিবাহিত যুবতী বোন—ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।—কি, বলছ কি?

—এই মাছ কটা নিয়ে যা। বেশ করে ভাজি করবি। কিংবা ঝাল।

টিকুরীর খুড়ী বলিল, অ মা গো? পুটি? তোমার বুন। এ যে হাতি হয়ে উঠেছে?

খুড়ীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া পুটি বলিল, আমি পারব না। হাঁড়ি চড়ে না, তার মাছভাজা? এ ঘরে তোমার মা ধুকছে জ্বরে, ওঘরে বউ ধুকছে। তুমি বসে বসে তবলা পিটছ? আমি এত পারব না। তোমরা সবাই আমার হাতির গতরই দেখেছ।

পুটি!—কড়াস্বরে ঘোঁতন শাসন করিয়া উঠিল।

পুটি যাইতে যাইতে ফিরিয়া মাছ কয়টা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, ভাজতে পারব না, পুড়িয়ে দিচ্ছি, খেয়ো। ঘরে তেল নাই। আর ডাক্তার-কবরেজ যা হয় ডাক—মায়ের জ্বর খুব।

—ম্যালেরিয়া জ্বর, ওর আবার ডাক্তার-কবরেজ কি হবে? হু হু করে উঠেছে, আবার খানিক পরে ছেড়ে যাবে। ইউনিয়ন বোর্ড থেকে মেপাক্রিন এনে দোব, খেলেই সেরে যাবে।

—ভাল, উদিকে ভাগীদার নেপাল কাহারের বউ এসে বসে আছে।

—ধান-টান দিতে আমি পারব না। সে বলে দেগা। ধান নাই তো দেব কোথা থেকে?

—ধান পরের কথা, এখন বেচন নাই। জমি চাষ হবে না। বেচন দেখে দাও গো।

—বেচন? বেচনই বা পাব কোথা আমি?

তবে থাকবে তোমার জমি পড়ে।—বলিয়া পুটি ঘরে চলিয়া গেল।

থাকুক গে! আমার কচুটা।—বলিয়া ঘোঁতন বুড়ো আঙুল দেখাইয়া দিল। তারপর খুড়ীকে বললে, খাই যেন একা আমি, বুঝলে খুড়ী? হুঁ। বলিয়া তবলায় অকারণে চাঁটি মারিয়া দিল।

—আমি চললাম বাবা। একটা তাগিদ দিস, বুঝলি?

বলিয়া খুড়ী উঠিয়া পড়িল।

আরও দিন পনের পর সেদিন বিকেলবেলা বেচারী পুটি আসিয়া উপস্থিত হইল বিপিন মোড়লের বাড়ি।

মোটা মোড়ল পায়ে সরিষার তেল মাখিতেছিল। তামাক সাজিতেছিল একজন কৃষাণ। পুটি আসিয়া দাড়াইল এক পাশে। বলিল, আমি একবার আপনার কাছে এলাম জ্যাঠা!

—কে? কে বল দেখি তুমি বাছা? চেনা-চেনা করছি, চিনতে ঠিক লারছি—

—আমি নবগেরেমের গোপাল ঘোষের কন্তে—

—গোপালের কন্তে? তুমি ঘোঁতনের ভগ্নি?

—হ্যাঁ।

—দেখ দেখি কাণ্ড! বড় হয়ে গিয়েছ। চিনতে লারছি।

—মা পাঠালে আপনার কাছে।

—বল, কি জন্তে পাঠালে?

—বললে পাঁচজন থাকতে বীচনের অভাবে আমাদের জমি চাষ হবে না?

—তোমাদের বীচন নাই? কি হল? তা তুমি এলে কেন? ঘোঁতন কই? ছি-ছি-ছি!

—তাকে তো জানেন। সে উ সব দেখবে না। আর তার সময়ও নাই।

রেজেস্টারী আপিস ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে সারাদিন কাজ তো! পুটি ক্ষীণযুক্তিতে ভাইকে রক্ষা করবার চেষ্টা করিল।

—হুঁ, তা কতটা জমির বীচন চাই?

—দশ বিঘে জমি; তার বিঘে ছয়েক পুঁতেছে, চার বিঘে পড়ে আছে —বীচন নাই।

—তাই তো বাছা! আমার খানিক বীচন আছে, বাঁচবে, কিন্তু বেনো জমির জন্যে রাখতে হবে। তা—

—আমাদের কি হবে?

—ঘোঁতন হলে বলতাম, উপোস করে মরবে। তা সে কথা তো তোমাকে বলতে পারছি না। দেখি সেতাবের বীচন বাঁচবে, সেতাবের হিসেব, মহাতাপের গতর—। তা সেতাব আবার ঘাড় পাতলে হয়? তুমি বাছা ওদের বড় বউকে গিয়ে ধর গা। নাঃ চল, আমিই যাই।

মোটা মোড়ল পথে নামিল। আপন মনেই বলিতে লাগিল, বুয়েচ মা, এই সেতাবের কত্তা বাবার নাম ছিল দয়াল মোড়ল, লোকে বলত দলু মোড়ল; আমার বাবার নাম ছিল পরেশ। দুজনা ছিল চাকলার মাথা। নবগেরামে তখন লতুন ফেশান ঢুকছে। দেখেশুনে দুজনে পরামর্শ করত আর বলত—দলো মলেই হল, আর পরশা মলেই ফরসা। তাও আমরা কিছু কিছু বজায় রাখলাম, এর পর সব খাঁ-খাঁ! উচ্ছন্ন দিলে। ইংরেজী ইস্কুলে ঢুকে—বাবু হয়ে ফেল মেরে ঘর ঢুকছে; জমি বেচে-বেচে খাচ্ছে বসে।

সারা পথটাই বকিতে বকিতে সেতাবদের দরজায় হাজির হইল। দরজা হইতে ডাকিল—সেতাব? সেতাব রয়েছ? অ সেতাব?

বাড়ির বাহির-দরজার বাহির হইয়া আসিল মহাতাপ, তাহার হাতে হুঁকা। ফরাত-ফরাত শব্দে হুঁকাটা টানিতে টানিতে বাহির হইয়া আসিয়া মাতব্বর খুড়ো মোটা মোড়লকে দেখিয়াই অপ্রস্তুত হইয়া গেল। চট করিয়া হুঁকা-সুদ্ধ হাতটা পিছনের দিকে করিল।

বিপিন বলিল, সেতাব কই?

মহাতাপের পেট ভর্তি তামাকের ধোঁয়া, সে দম বন্ধ করিয়া বলিল,

তামাক খান। বলিয়া হুঁকাটা বিপিনের হাতে দিয়া পিছন ফিরিয়া হুস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল। এবং এতক্ষণে সচ্ছন্দ হইয়া বলিল, বসুন, উঠে বসুন।

দাওয়ার উপর উঠিয়া মোড়াটা আগাইয়া দিল। পুটি অদূরে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল।

বিপিন মোড়ল দাওয়ায় উঠিয়া মোড়ায় বসিয়া ডাকিল, এইখানে এস বাছা। অ পুটি!

মহাতাপ সবিস্ময়ে বলিল--পুটি! এই লাও, ঘোঁতনা তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

পুটি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল।

মহাতাপ বিপিনকে বলিল, তোমরা হুকুম দাও জেঠা, ঘোঁতনকে আমি কিলিয়ে সোজা করে দিই। বড়া বজ্জাত। নচ্ছারটা বড়া বজ্জাত। এ মেয়েটা ভাল। যা গালাগাল দেয় আর মারে ওকে—। আমি চোতপরবের সঙের সময় দেখে এসেছি।

বিপিন বলিল, তুই থাম্ মহাতাপ! ও তার জন্যে আসে নি।

মহাতাপ আগাইয়া গিয়া বলিল, তার জন্যে আসে নি! কই বলুক পুটি, বলুক কালীমায়ের দিব্যি করে—ঠাস ঠাস করে চঁড়িয়ে দেয় কি না? বলুক।

পুটি দায়ে পড়িয়াছে। সে না পারে স্বীকার করিতে, না পারে প্রতিবাদ করিতে। স্বীকার করায় লজ্জা আছে, প্রতিবাদে কুণ্ঠা আছে, আশঙ্কা আছে; মহাতাপ তো নিজেই কালীর দিব্যি গালিয়া চাক্ষুষ দেখার কথা চিৎকার করিয়া বলিবে এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত 'বীচন দিব না' বলিয়া বসিবে।

বিপিন মোড়ল প্রবীণ লোক। সে পুটিকে নতমুখ দেখিয়া বলিল, না রে বাপু, না। আজ ও অন্য কাজে এসেছে। ওদের জমির বীচন নাই। বীচন খোঁজ করতে এসেছে।

হরিবোল! হরিবোল! মহাতাপ হাসিতে লাগিল।

—হাসছিস ক্যানে?

—বীচন হয় নাই তো! সে আমি জানতাম—প্রচুর কৌতুকে সে হাসিতে লাগিল।—তুষ ফেললে বীজ হয় খুড়ো? আমি জানতাম। ঘোঁতনের ভাগীদার নেপাল যেদিন বীচন ফেলে, সেইদিনই আমি বলেছিলাম। আমি বললাম, ই কি রে? এ যে সব তুষ! এতে বীজ হবে ক্যানে? নেপাল বললে—আমি কি করব? ঘোঁতন ঘোষ বললে—যা হয় ওতেই হবে। আমি বললাম—দে তবে গোঁজ গোঁজায় নমো করে। মহাতাপ খুব হাসিতে লাগিল।

বিপিন বলিল, কিছু বীচন দিতে হবে। তোর তো নিশ্চয় আছে।

হঁ্যা।—অহঙ্কার করিয়া মহাতাপ বলিল, জরুর আছে, আলবত আছে। কিন্তু ঘোঁতনকে নেহি দেঙ্গা—

—দোব না বললে কি হয়? দিতে হবে। ডাক্, সেতাবকে ডাক্।

সেতাব!—রাগিয়া উঠিল মহাতাপ।—সেতাব কি করবে? সেতাব? মাঠে যতদিন বীচন থাকবে ততদিন সেতাবের এক গাছ নেহি হ্যায় বাবা। সব মহাতাপের। বিলকুল। হঁ্যা ধান কাটেগা, ঘরে আনেগা, ঝাড়াই করেগা, গোলায় তুলেগা, তারপর উ যা করেগা তা করেগা। মাঠকে মালিক হাম হ্যায়—হাম। একবার ঘোঁতনার মায়ের কথায় ধান ছেড়ে দিয়েছি, সবাই বকেছে আমাকে। মহাদেবের পাট নিয়ে দশ টাকা চাঁদা দিয়েছি। উঁহু, আর নেহি দেগা।

এবার পুটি বলিল, আমার মাই আমাকে পাঠিয়েছে মহাতাপদাদা। জমি পোতা না হলে আমরা খাব কি বল?

—খাব কি? শুধু তোরা খাবি? ঘোঁতন খাবে না? আগে ভাত বেড়ে তো তাকে দিবি।

হঠাৎ বিপিন মোড়ল পুটিকে বলিল, চল বাড়ির ভিতর চল। ডাক, চাঁপাডাঙার বউমাকে ডাক। বউমা তো তোমাদের আপনার গো। বউমার মা তোমার মা তো সই!

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, বড়বউয়ের শরীর খারাপ। সে শুয়ে আছে। উঁহু।

সত্যই বড় বউ ঘরের মধ্যে শুইয়া ছিল। শরীর খারাপ বলিয়া শুইয়া আছে। আসলে টিকুরীর খুড়ীর সেই মর্মান্তিক কথা কয়টা বিষাক্ত তীরের মত তার মর্মস্থল বিঁধিয়া অবধি তাহাকে বিষণ্ণ ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কথা কয়টার বিষে তাহার অন্তর এমনই জর্জর হইয়া গিয়াছে যে, সংসারের জীবনে যেন রুচি পর্যন্ত বিস্বাদ ঠেকিতেছে। অপর সকলের কাছে কথাটা গোপন করিবার অভিপ্রায়েই সে শরীর খারাপের অজুহাতে আপন ঘরে শুইয়া আছে। সে চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। মাথার দিকে জানালার ধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর মৃদুস্বরে বকিতেছিল।

—একে বলে, এ তো ভারি বিপদ করলে তুমি! এ তো বড় ফ্যাসাদ! টিকুরীর খুড়ী কি বললে, আর তুমি গিয়ে শয্যা পাতলে! ওঠ—ওঠ।

—না। আমাকে জ্বালিয়ো না। আপনার কাজ দেখগে যাও।

—ওই! তুমি না খেয়ে পড়ে থাকবে, আর আমি কাজ দেখব? ওঠ ওঠ। কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে। টিকুরীর খুড়ী বললে, ভাগী ভাঁড়িয়ে পুঁজি করি বলে তোমার ছেলে হয় নাই। টিকুরীর খুড়ী একেবারে সাক্ষাৎ বেদব্যাস। তা হয় নাই তো হয় নাই। ছেলে নাই তো নাই—

—কি বললে? বড় বউ উঠিয়া বসিল। সেতাব ভয় পাইয়া থামিয়া গেল। চাঁপাডাঙার বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি বললাম?

—ছেলে নাই তো নাই। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের কথা আলাদা। কিন্তু—

বড় বউ বিচিত্র হাসি হাসিল।

সেতাব সে হাসি দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। বড় বউয়ের হাসিতে যে আগুন ছিল, সেই আগুন তাহার অন্তরের সঞ্চিত সন্তানকামনার গোপন ক্ষোভের শুষ্ক দাহ্য বস্তুতে ধরিয়া গেল। কথাটা দুই জনেই পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। সেতাব চাঁপাডাঙার বউয়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিল—বড় বউয়ের মত বিচিত্র দৃষ্টিতে। তারপর হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া বলিল, আলাদা? পুরুষের কথা আলাদা? না? হঠাৎ উঠিয়া

দাঁড়াইয়া সে বলিল, এক সময় মনে হয়—। সে থামিয়া গেল এবং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বড় বউ উঠিয়া দাঁড়াইল। সেতাবের গায়ের কাপড়ের খুঁট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কি মনে হয়? বলে যাও।

সেতাব বলিল, মনে হয় ঘর-দোর-ধান-ধনে আগুন দিয়ে চলে যাই।

বড় বউয়ের হাতখানা খসিয়া পড়িল।

আমার মনে হয় না—ছেলের কথা? আমার সাধ নাই। মনে হয় না এ সব আমি ক্যানে করছি? কার জন্যে করছি? কে ভোগ করবে? আমার জলগণ্ডূষের সাধ নাই! পেরেত হয়ে জলের জন্য হা-হা করে বেড়াতে হবে না আমাকে? তবু কি করব?—

সেতাব চলিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল! মনে হইল আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে, মাটি ফাটিতেছে। ফাটুক। তাই ফাটুক! সে তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া থাক।

ঠিক এই মুহূর্তে নীচে হইতে বিপিনের ডাক শোনা গেল—বড় বউমা! চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। তবু মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল।—কে?

পাশের ঘরের জানালাটা খুলিয়া মানদা মুখ বাড়াইয়া বলিল, পঞ্চায়েতের শিব মোড়ল—মোটা মোড়ল এসেছে দিদি!

চাঁপাডাঙার বউ কোন রকমে উঠিয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

বিপিন নীচেই দাওয়ার উপর চাপিয়া বসিয়া ছিল। তামাক খাইতেছিল। পুটি একটি খুটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল একপাশে। সেতাব হনহন করিয়া নামিয়া আসিল এবং পুটিকে দেখিয়া খানিকটা অবাক হইয়া গেল। সে পুটিকে ঠিক চেনে নাই। এমন কালো অথচ শ্রীমতী এত বড় একটি মেয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর নাই, বিধবা বা কুমারী ঠিক ঠাওর করা যায় না; এ কে? কিন্তু চমৎকার মেয়ে! তাহাকে দেখিয়া বিস্ময় স্বাভাবিক ভাবেই জাগিয়া উঠিবার কথা।

মহাতাপ উঠানে বসিয়া একটি কাঠ দিয়া দাগ কাটিতেছিল এবং বলিতেছিল, সে হোগা নেহি, কভি নেহি।

সেতাব বলিল, কি গো খুড়ো?

বিপিন বলিল, এই যে তুমি বাড়িতে আছ। তুমি নাই ভেবে অগত্যে বড়বউমাকে ডাকছিলাম।

সেতাব হুঁকোটা লইয়া টানিল না। সে পুটিকেই দেখিতেছিল। হাতের কাঁচের চুড়ি, লোহা দেখিয়া এতক্ষণে বুঝিল মেয়েটি কুমারী। কিন্তু এত বড কুমারী মেয়ে? কার বাড়ির? বলিল, এ মেয়েটি?

মহাতাপ উত্তর দিল—ঘোঁতনা—ঘোঁতনার বোন।

ঘোঁতনের ভগ্নি?

বিপিন বলিল, হ্যাঁ, গোপালের কন্যে। বেচারী এসেছে, ওদের বীচন নাই। জমি পড়ে আছে। চার-পাঁচ বিঘের মতন বীচন নাই। ঘোঁতন বলে দিয়েছে, সে কিছু জানে না। কি করে বল? ওকেই আসতে হয়েছে। এত বড় কুমারী মেয়ে, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ—। তা পাগল বলছে—নেহি দেগা। তোমরা সব ওকে বকেছ ঘোঁতনকে ধান ছেড়ে দেওয়ার জন্য, তাই ও আর বীচন দেবে না। তাই।

সেতাব বলিল, গোপাল ঘোষ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে খুড়ো, সে তুমি জান। কিন্তু আমি মনে রাখিনি। ঘোঁতনকে গতবার ধান দিয়েছিলাম। সে বৃত্তান্তও সব জান। আবার বীচনও দোব। পাবে বীচন। পুটি এসেছে যখন, বুঝছি—ওর মা পাঠিয়েছে। গোপাল ঘোষ যা করুক—ঘোঁতন যা করুক—ঘোঁতনের মা—বড় বউয়ের সইমা! আমার পূজ্য লোক। দিতে হবে বৈকি, দোব বীচন। বড় বউ বলবে কি? বীচন দোব। পাবে, বীচন পাবে।

মহাতাপ অবাক হইয়া গেল। সেতাবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বীচন দেবে?

—হ্যাঁ, জমি তো পুঁততে হবে?

মহাতাপ তাহাকে বলিল, তুমি আর নেহি বাঁচেগা। মর যায়েগা। জরুর মর জায়েগা।

সেতাব বলিল, কি বকছে দেখ। সিদ্ধি খেয়েছিস ?

—কি বকছি ? আ-হা-হা ? তুম এক বাতমে বীজ খয়রাত কর দিয়া ? তুম চামদড়ি, তুম কিপটে ; তুম দাতাকর্ণ বন গিয়া, তুম নেহি বাঁচেগা। কিন্তু আমি বীচন দোব না। কভি না। শূয়ার ঘোঁতনা যদি পিঠে একটা কিল খায় আমার তবে দোষী। নেহি তো কভি না।

সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পুটি হাসিয়া ফেলিল।

বড় বউ এবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বীচন পাবে কাকা। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

তারপর পুটিকে বলিল, ওরে, তুই কত বড় হয়েছিস পুটি ? এতদিনে বীচনের জন্যে দিদি বলে মনে পড়ল ? সইমা কেমন আছে ?

তাহাকে লইয়া সে বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

—মায়ের খুব জর দিদি। মা তোমার কথা প্রায়ই বলে।

—কি বলে রে ?

—কত কথা বলে। বেশী বলে—কাদু আমার ভাগ্যবতী, গুণবতী, রূপবতী—মায়ের কাছে সবই ভাই তুমি।

কাদম্বিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, সইমা আমাকে বড় ভালোবাসে।

—সেদিন রূপের কথায় বলছিল—সে দেখতে হয় কাদুকে। যেমন মুখ-চোখ, তেমনি গড়ন-পেটন—আহা-হা, এখনও যেন কনে বউটি ?

—মরণ আমার রূপের। মরণ আমার কনে বউয়ের ছিরির ? কে যেন কাদুর অন্তরে অন্তরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

পুটি তাহা বুঝিল না, সে উৎসাহভরে বলিল, শোন—এই শেষ না কি ? আমার এক পিসী বললে—তা বাঁজা মেয়ের দেহের বাঁধন ভাল থাকে। মা বললে— কি হল দিদি ? দিদি ?

কাদম্বিনী পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মুখখানা তাহার কেমন হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

সে এক হাতে গলার কবচটা চাপিয়া ধরিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভাদ্র মাস পড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন ষষ্ঠীর দিন। চাষীর গ্রামটির পাড়ায় পাড়ায় এক এক ঘরে হুলুধ্বনি পড়িয়াছে। মেয়েরা ষষ্ঠীর ব্রতকথা শুনিয়া উলু দিতেছে। রোদে শরতের আমেজ ধরিয়াছে। ভাল চাষীদের চাষ প্রায় শেষ। মহাতাপ তো রোয়ার কাজ শেষ করিয়া নিড়ানের কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

সেতাবের বাড়ির ভিতরেও মেয়েরা বসিয়া ষষ্ঠীর ব্রতকথা শুনিতেছে।

সেতাব গোয়াল-বাড়িতে দাঁড়াইয়া ছিল। রাখালটা দুধ দুহিতেছে। গোয়াল-বাড়ির উঠানে ধানের বীচনের একটি বোঝা পড়িয়া আছে। বীচনের বোঝাটি ঘোঁতনের জমির জন্য তুলিয়া আনা হইয়াছে।

বাড়ি আসিয়া ঢুকিল পুটি।

সেতাব তাহাকে দেখিয়া বেশ প্রসন্ন হইয়াই বলিল, এই দেখ! বীচন তোলা আজ তিন দিন পড়ে আছে!

পুটি লজ্জিত হইয়া বলিল, কি করব। জমির পাট হয় নাই। লোকজন নাই। নেপালের এক হাতের কাজ। তার ওপরে ভাগীদের কাজ।

সেতাব অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল, আজ আবার ষষ্ঠী। আজও ভাবলাম —। সে হাসিল।

পুটি বীচনের বোঝাটা নাড়িতে চেষ্টা করিল।

সেতাব বলিল, ওই—ওই? একে বলে, ওই বোঝা তুমি তুলতে পার? বীচন নেবে কে? নেপাল কই?

—নেপাল জমিতে মই দিচ্ছে। ষষ্ঠীর দিন নেপালের বউ আসে নাই।

—তবে?

—আমিই নিয়ে যাব।

—এই দেখ। বলি তাই হয় না কি?

পুটি এবার ডাকিল, দাদা, অ দাদা!

বাহির হইতে ঘোঁতন সাড়া দিল, কি? আয় না বোঝাটা মাথায় তুলে দিবি।

সেতাব বলিল—ঘোঁতন এয়েছে! কই? অ ঘোঁতন! ঘোঁতন!

ঘোঁতন এবার ঘরে ঢুকিল। তাহার পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফসার্ট—অবশ্য দুইটাই পুরানো। সে ঘরে ঢুকিতেই সেতাব বলিল, বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যানে রে? দেখ দেখি। তা তোর লোক কই? এ বোঝা নেবে কে?

ঘোঁতন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল—শুধাও তাই পুটিকে। বললাম, আজ ষষ্ঠী, কাল নেপালের বউ আসবে, কাল সেই নিয়ে যাবে। তা বলে—তুমি তুলে দিয়ো আমি নিয়ে যাব। আমি বললাম—তাই যাবি তো চ! আমার কি!

পুটি বলিল, তাই দাও না তুলে। ধর।

সেতাব ব্যস্ত হইয়া বলিল, এই—! ওরে নোটন! নোটন! যা তো, যা তো, বীচনের বোঝাটা মাঠে দিয়ে আয় তো! যা তো!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ভিতরে উলু পড়িল।

বাড়ির ভিতরে উঠানে ৭।৮টি মেয়ে সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিয়াছে। সকলেই স্নান সারিয়া এলোচুলে গোল করিয়া বসিয়াছে।

উলু দিয়া প্রণাম করিয়া সকলে উঠিল।

যে প্রবীণা ব্রতকথা বলিতেছিল, সে বলিল, এ ব্রত করলে কি হয়?

নিজেই উত্তর দিল—নিঃসন্তানের সন্তান হয়। সন্তান মরলে, সেই সন্তান জিউ পায়। রণে গোনে অরুন্যে মা ষষ্ঠী বুক দিয়ে রক্ষা করেন।

চাঁপাডাঙার বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজার চৌকাঠে একটি ফোঁটা দিল। ষষ্ঠীর প্রসাদী হলুদতেলের ফোঁটা।

একটি মেয়ে বলিল, দরজার মাথায় কাকে ফোঁটা দিচ্ছ চাঁপাডাঙার বউ?

বিষণ্ণ হাসিয়া বড় বউ বলিল, দেওরকে ভাই। সে তো মাঠে। শাউড়ী বলে গিয়েছে—বউমা, ওকে ফোঁটা তুমি চিরকাল দিয়ো।

মেয়েরা বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

এবার চাঁপাডাঙার বউ ডাকিল, মানিক? মানু, মানিক কই?

মানু কাছে আসিয়া বলিল, তাকে পুরে রেখেছি ঘরে। কোথায় বেরিয়ে পালাবে। বলিয়াই সে চাঁপাডাঙার বউয়ের হাতের হলুদতেলের বাটী হইতে খানিকটা হাতের তেলোয় তুলিয়া লইয়া বন্ধ ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল।

বড় বউ চকিত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। একটা সন্দেহ তাহার মনে সাড়া দিয়াছে। পাছে সে আগে মানিককে ফোঁটা দেয়, এই ভয়েই কি মানু এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে?

মানু মানিককে কোলে লইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং বড় বউয়ের সামনে দাঁড়াইল।

বড় বউ মানিকের মুখের দিকে চাহিয়া বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল, এই যে ফোঁটা দিয়েছিস তুই? বলিয়া সেও ফোঁটা দিল মানিকের কপালে।

মানু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি হাসলে ক্যানে বড়দি?

— আমি পাছে আগে ফোঁটা দিই, তাই তুই আগে ফোঁটা দেবার জন্যেই ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলি। তাই হাসলাম। তা, আমাকে আগে বললেই পারতিস!

মানু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তোমাতে আর ভাসুরে সেদিন ঘরে কথা বলছিলে, সে সব কথা আমি শুনেছি বড়দি। মানিক নিয়েও তো তোমাদের বুক ভরে না।

মানু মানিককে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

চাঁপাডাঙার বউ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। দেহখানা তার অবশ হইয়া গিয়াছে। সে তাহার গলায় সুতার ডুরিতে বাঁধা কয়েকটা মাদুলি টানিয়া বাহির করিয়া নাড়িতে-চাড়িতে লাগিল।

দিন কয়েক পর সেতাব বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল। হনহন করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। মিনিটখানেক পরেই ডাকিল, শোন তো একবার! বলি শুনছ?

বড় বউ আসিয়া ঘরে ঢুকিল!

সেতাব তাহার কোঁচড়ে কিছু গুঁজিতেছিল। দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয়

না যে বস্তুটা টাকা। বড় বউ আসিয়া দাঁড়াতেই সেতাব বলিল, দেখ ঘোঁতন ঘোষ এয়েছে। বুয়েচ ? একে বলে—বলছে, নবগ্রামের রাখহরি দত্তর ছেলে চার-পাঁচ ভরির সোনার হার বাঁধা রেখে টাকা নেবে। বলছে তিনশো, তা আমি বলছি, দুশো। মেরে কেটে আড়াই শো। সুদ টাকায় মাসে ছ পয়সা। দোব ? বলব তাকে আসতে ?

বড় বউ বলিল, মহাতাপকে শুধাও।

—তুমি ক্ষেপেছ না কি ?

—না। তাকে না শুধিয়ে কোন কাজ তুমি করতে পাবে না।

স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সেতাব বলিল, এ তো ভ্যালা আবদার রে বাবা। মহাতাপ, মহাতাপ, মহাতাপ করে আমাকে জ্বালিয়ে খেলে তুমি। বলি মহাতাপ তো আমার মায়ের পেটের ভাই। না-কি ? তুমি এত হাঁপাও ক্যানে ?

বলিয়াই সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সে যখন দাওয়ায় বাহির হইল, তখন মানদা এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিল।

বাহিরে ঘোঁতন দাওয়ার উপর মোড়ায় বসিয়া পা নাচাইতেছিল এবং ছোট একটা আয়না-চিরুনি লইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শিস দিতেছিল।

কাছে দাঁড়াইয়া ছিল গোবিন্দ—সেই রাখাল ছেলেটি।

সেতাব আসিতেই গোবিন্দ পলাইল।

সেতাব বলিল, এই লাও। বলিয়া পাঁচটি টাকা ঘোঁতনকে দিল এবং বলিল, দোব, তাই দোব। বুঝলে, বলে দিয়ো।

ঘোঁতন আয়না-চিরুনি পকেটে রাখিয়া টাকা পাঁচটা রুমাল বাহির করিয়া খুঁটে বাঁধিল। বলিল, তোমাকে লোকে খারাপ লোক বলত বুয়েচ, আমিও বলতাম। কিন্তু তুমি তা লও। বুয়েচ, এ আমি বুঝেছি। বুয়েচ! মুখ্‌খুতে বলবে, কিন্তু আমি মুখ্‌খু লই। তুমি গুড ম্যান, তবে হ্যাঁ, স্ট্রীক্ট্ ম্যান—

সেতাব বুদ্ধি ধরে বিচক্ষণ, সে চ্যাংড়াও নয়। তাহার উপর সে পঞ্চায়েতের

মণ্ডল। সে বলিল, তুই বড় ফাজিল ঘোঁতন। বড় বেশি বকিস। যা, বাড়ি যা। রাখহরির ছেলেকে পাঠিয়ে দিস। আর শোন্। আর একটা কথা বলি। নিজে একটু খাটিস্। এত বড় আইবুড়ো বোনটাকে অমন করে খাটাস না। বুঝলি?

ঘোঁতন বিচিত্র মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, ওরে বানাস রে? তা এক কাজ কর না। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিল, তুমি পুটিকে বিয়ে কর না। তোমার তো ছেলেপুলে হল না।

সেতাব প্রথমটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—ইয়েকে বলে, ইয়েকে বলে—। তারপর অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘোঁ-ত্-না—

—এই দেখ, রাগ করছ ক্যানে? ঘোঁতনা হাসিল।—ও বউয়ের ছেলে-পুলে হবে না তোমার। আর তোমার ওপর টানও নাই তার। সে যা কিছু—

সেতাব আবার আরও জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘোঁ-ত্-না—

ঘোঁতনা আরও কি বলতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে মহাতাপের গলা শোনা গেল রাস্তার বাঁকে। সে গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল—

কাজুলী কাজুলো ও আমার আখের
বনের আদুরী, কালো বরন কাজুলী—
তোর পয়ে হবে আমার বউয়ের
গলায় হবে মাদুলী

ঘোতন চমকিয়া উঠিয়া প্রায় লাফ দিয়া নামিল রাস্তায়। বলিল, চললাম। পাঠিয়ে দোব রাখহরির ছেলেকে।

সে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

সেতাবের হুঁকা-ধরা হাতখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখে তাহার বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়াছে। মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে।

মহাতাপ ওদিক হইতে দুইজন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল, বলিল, এই লাও। গুড় কিনতে এসেছে। আলুর বীচন কিনবে। সাহজী, এই হামরা দাদা। ওই দাম-দর করেগা।

চমকিয়া উঠিল সেতাব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

মহাতাপের সর্বাঙ্গে কাদা। সে জমি নিড়াইতেছিল। বাড়ি ফিরিবার পথে গুড়ের পাইকারদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

তাহাদের বসাইয়া সে হাঁকিতে হাঁকিতে বাড়ি ঢুকিল, বড় বউ! ও বড় বউ। সুর করিয়া আবদারের ডাক।

ছোট বউ দাওয়ায় বসিয়া ময়দা মাখিতেছিল। সে বলিল, অ মাগো! ডাকের ঢঙ দেখ একবার!

মহাতাপ গ্রাহ্য করিল না। বলিল কোথা গেল বড় বউ?

ছোট বউ বলিল—উত্তাপের সহিতই বলিল, তার শরীর খারাপ। ঘরে শুয়ে আছে।

মহাতাপ বলিল, শরীরের কিছু না বলেছে! রোজ শরীর খারাপ! রোজ শরীর খারাপ! অ-বড় বউ! বড় বউ!

বড় বউ বাহির হইয়া আসিল। বলিল, কি বলছ?

—বলি ফোঁটা দেবে না আমাকে? ষষ্ঠীর ফোঁটা?

বড় বউ হাসিয়া বলিল, দেব বইকি! চৌকাঠে দিয়েও মন তো মানে নি। জল না খেয়েই বসে আছি।

—আর একটি কথা শোন।

—বল।

—গুড়-আলুর খরিদ্দার নিয়ে এসেছি। হিন্দুস্থানী পাইকার।

—তা বেশ তো। বেচ দুই ভাইয়ে যুক্তি করে।

—সে যুক্তি তুমি তার সঙ্গে কর গিয়ে! ওসব আমি জানি না। আমার কৃষাণের ভাগের দশ মণ গুড় চাই। আমি বিক্রি করেগা। সে কথা হয়ে আছে। তুমি সাক্ষী। সে টাকা হাম লেঙ্গে। ১৮৲ টাকা করে মণ। ১৮০৲ রূপেয়া।

—আচ্ছা পাগল তুমি। সবেরই তো অর্ধেক ভাগ তোমার। নাও না দাদার কাছে।

—উঁহু। উ সব নেহি মাংতা। এই আমার কৃষাণের ভাগটা চাই।

মানু বলিয়া উঠিল, পাগল লোকে সাধে বলে না! মরণ!

—চুপ রহো, চুপ রহো, আরে দুষ্টু সরস্বতী, চুপ রহো। ওহি টাকাসে হম হার গড়ায়েগা। বড়া বহুকে লিয়ে আর তুমহারা লিয়ে। কেয়া দুষ্ট সরস্বতী, এরে ময়না— বোলো রাধা কিষণ, বোলো মিঠি বাত! সোনেকা হার! সোনেকা হার!

মানু বলিয়া উঠিল, একশো আশী টাকায় দুজনের সোনার হার! এ যে সেই দুপয়সার মণ্ডা কিনলাম, আমি খেলাম, আমার দাদা খেলে, তারপর ফেলে দিলাম, কুকুরে খেলে, তাও শেষ করতে পারলে না, পড়ে থাকল। নব্বই টাকা সোনার ভরি।

মহাতাপ এবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল—এ, তু মু সামালকে বাত কহো— আশী রূপেয়াকে হারসে মন উঠতা নেহি; অঃ, তেরা লিয়ে পাঁচশো আশী রূপেয়াকে হার চুরি করকে আনেগা হম! দেখো বড়া বহু—

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, চুপ কর মহাতাপ। ছি, কতবার বলেছি তোমাকে, এমন কথা বোলো না মানুকে। আর মানু, মানুষটা বড় মুখ করে কথা বললে, তাকে কি ওই ভাবে কথা বলে?

—না, বলে না! আশী টাকায় হার—তাও রুপোর না সোনার! সেই পাঁচ সিকের জমিদারি!

—বেশ তো হার শুধু তোর জন্যেই হবে।

—নেহি। কভি নেহি। কখনও না।

—আমি হার পরব না। আমার চাই না ভাই।

মানু এবার হঠাৎ খুব ভাল মানুষ হইয়া গেল; একেবারে একমুখ হাসিয়া অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় অতি মোলায়েম করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আশী টাকার হার পরে, না, মানায় দিদিকে! পাঁচশো আশী টাকার হার পরবে দিদি, হারের বায়না আজ হয়ে গেল। বুঝেছ?

বলিয়াই সে ময়দার থালাটা হাতে লইয়া অত্যন্ত দ্রুত উঠিয়া চলিয়া গেল।

বড় বউ আর্তকণ্ঠে ডাকিল—মানু—! তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে এক মুহূর্তে; কে যেন তাহাকে অতর্কিতে নিষ্ঠুর আঘাতে চাবুক হানিয়েছে মুখের উপর।

ছোট বউ ঘরে ঢুকিবার মুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চার পাঁচ ভরির হার দুশো আড়াইশো টকায় খুব সস্তা বড়দি—জলের দর। ওতে তুমি এতটুকু খুঁতখুঁত কোরো না। বড় ভাল মানাবে তোমাকে।

বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মহাতাপ কিন্তু উল্লসিত হইয়া উঠিল; সে পরমোল্লাসে বলিয়া উঠিল, সত্যি কথা? বড় বউ আমার দিব্যি, বল? আরে বাপ রে বাপ রে! চামদড়ি কিপটের এ কি সুমতি! সেদিন পুটি আসবামাত্র বীচন দিয়ে দিলে। আজ তোমাকে সোনার হার! বলিহারি বলিহারি! আজ দাদাকে পেনাম করেগা, পায়ের ধুলো লেগা!

সে পরমানন্দেই বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বাহির-বাড়ির রাস্তার ধারের দাওয়ার উপর হিন্দুস্থানী দুইজন বসিয়া পিতলের থালায় ছাতু ভিজাইয়াছে, লঙ্কা-নুন রাখিয়াছে। লোটার জলে হাতমুখ ধুইতেছে। সেতাব বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। তখনও সে যেন কেমন হইয়া আছে। মাথাটা তাহার কেমন করিতেছে।

মহাতাপ আসিয়া হঠাৎ গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

সেতাব চমকিয়া উঠিল—ওই! ওই! এ কি রে বাপু? ও কি?

—পরনাম। তোমাকে পেনাম করলাম।

—ওই! হঠাৎ পেনাম ক্যানে রে বাপু?

—তুমি—। তারপর ওই হিন্দুস্থানী দুইজনের কথা মনে করিয়া চুপ করিয়া গেল। বলিল, শুনেছি, আমি শুনেছি। হাসিতে লাগিল।

—কি?

—বলব, বলব। দাও, হুঁকোটা দাও।

সে হুঁকাটা প্রায় টানিয়াই লইল সেতাবের হাত হইতে এবং পিছন

ফিরিয়া হুঁকা টানিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ওই গুড়ের পাইকারদের কাছে। ভিজানো ছাতুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভিজানো ছাতু বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, ই কেয়া হ্যায়? ছাত্তু? সাহজী!

সাহুজী উত্তর দিল, হুঁ, সত্তু!

মহাতাপ বলিল, হুঁ হুঁ! বহুত আচ্ছা চিজ! নুন-লঙ্কা দিয়ে আচ্ছা লাগতা হ্যায়, না?

সাহু হাসিল। বলিল, বাঙালীকে হজম নেহি হোতা।

বিকালের দিকে ওজন করিয়া গুড় বিক্রয় হইতেছিল। খামারে একটা কাঁটা-ওজন খাটাইয়া টিন-বন্দী করিয়া গুড় ওজন করিতেছিল রাখাল পাল। সেতাব দাওয়ায় বসিয়া খোলার কুচিতে করিয়া মাটির উপর একটার পর একটা দাগ দিয়া হিসাব রাখিতেছিল। পাশেই একটা গামলা। গামলায় আধ-গামলা গুড় রহিয়াছে। টিনে গুড় বেশী হইলে তাহার ভিতর হইতে হাতায় করিয়া গুড় তুলিয়া গামলায় রাখিতেছিল, আবার কম হইলে পূরণ করিয়া দিতেছিল। কাঁটায় ওজন করিতে রাখালের দক্ষতার খ্যাতি আছে। সে খ্যাতি—খোল বাজানোর খ্যাতির সমান। রাখালের ওজন-করা জিনিস কখনও কম-বেশী হয় না! আর তেমনি দ্রুত ওজন করে।

একদিকে একটা আধ মণ, অন্যদিকে টিন।

কাঁটাটা দুলিতেছিল। রাখাল কাঁটার উপরে একটা হাত রাখিয়া কাটার দিকে তাকাইয়াছিল, আর সুর করিয়া বলিতেছিল, তের রাম তের—তের রাম, তের রাম তের রাম—

খানিকটা গুড় তুলিয়া লইয়া বলিল, তের রামে চৌদ্দ। চৌদ্দ। ওঠাও।

নোটন টিনটা নামাইয়া রাখিল। তেরটা টিন আগে হইতেই সাজানো ছিল। এটা রাখিতেই চৌদ্দ হইল। রাখাল বলিল, চৌদ্দ, চৌদ্দ। চাপাও।

নোটন আর একটা টিন চাপাইল।

—চৌদ্দ রাম। চৌদ্দ রাম। চৌদ্দ রাম।

ওদিকে কাঁকালে একটা, মাথায় একটা, দুইটা টিন লইয়া বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া হাজির হইল মহাতাপ।

—ধর্ নোটনা ধর্। আগে কাঁকালেরটা।

নোটন কাঁকালেরটা ধরিতেই সে নিজেই মাথারটা নামাইল। তাহার গায়ে হাতে গুড় লাগিয়াছে। রাখাল হাঁকিল, চৌদ্দ রাম, চৌদ্দ রাম—পনের। পনের। পনের।

মহাতাপ নিজের হাতটা লইয়া গিয়া গোরুটার মুখের কাছে ধরিল।—লে, চেটে লে। গোরুটাকে চাটাইয়া লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

রাখাল হাঁকিতেছিল—পনের্ পনের্ পনের্।

ওদিকে বাড়ির ভিতরে জালার ভিতর হইতে বাটিতে করিয়া গুড় বাহির করিয়া টিনে ঢালিতেছিল বড় বউ। গাছ-কোমর বাঁধিয়া সে কাজ করিতেছে।

দাওয়ায় বসিয়া মানিক মুড়ি ও গুড় খাইতেছে। পাশেই তাহার বাঁশিটি পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে পু করিয়া দিতেছে।

মানদা টিনের পাশে বসিয়া টিনের গায়ে যে গুড় পড়িতেছে সেই গুড় চাঁচিয়া লইয়া একটা পাত্রে জমা করিতেছে।

মহাতাপ ঘরে আসিয়া ঢুকিল। টিন ভরা হয় নাই দেখিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, বলিল, আরে রাম রাম, এখনও টিন ভরে নাই?

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, দিচ্ছি, দিচ্ছি, হাত তো আমাদের দুটো; চারটে তো নয়। চতুর্ভুজো দেখে বউ আনলেই তো পারতে তোমরা! সবুর কর, ঘোড়াটা বাঁধ।

এখন কাজের মধ্যে চাঁপাডাঙার বউয়ের সে বিষণ্ণতাটুকু আর নাই। এই সময়ই বাহির হইতে রাখাল ডাকিল, এক ঘটি জল দেবে বউমা? বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মানদা বলিল, গুড়ের লোভে আবার জল খেতে এসেছে গেঁজাল। ওজন করবার আর লোক পেল না।

বাহির হইতে রাখাল বলিল, শুনছ, অ বড় বউমা!

চাঁপাডাঙার বউ একটা বাটিতে গুড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। মহাতাপকে বলিল, তুমি বার কর হে ততক্ষণ।

রাখাল বলিল, গুড় কিন্তু ফাস্টো কেলাস মা। কি সুবাস! আর কি তার। সুন্দর! সে বসিয়া হাত চাটিতেছিল, চাঁপাডাঙার বউকে দেখিয়া হাতখানা পাতিয়া বলিল, তা দেবা নাকি একটুকুন? তা দাও।

চাঁপাডার বউ বাটিটা নামাইয়া দিয়া অন্য ঘরে জল আনিবার জন্য চলিয়া গেল। রাখাল লম্বা জিভ বাহির করিয়া বাটি হইতে চাটিয়া চাটিয়া গুড় খাইতে লাগিল। হঠাৎ মহাতাপ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—যেন পলাইয়া আসিল এবং খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে মানদাও পিছন পিছন বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, দেখ দেখ, কি করণ দেখ! কাণ্ড দেখ! কথাগুলির মধ্যে আদরের সুর। ছলনা করিয়া মিছামিছি কান্নার ভান। মহাতাপ তাহার দুই গালে গুড় মাখাইয়া দিয়াছে। পুলকিত হইয়াই মানু কাঁদিতেছে।

সেই কৌতুকে মহাতাপ খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

রাখালও কৌতুকে খুকখুক করিয়া হাসিতে লাগিল। বড় বউ আসিয়া জলের ঘটিটা নামাইয়া দিয়া বলিল, মানিককে বল চেটে খেয়ে নেবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে! যাও তো বাবা মানিক, মায়ের গালের গুড় চেটে—

এই রঙ্গ দেখিয়া মানিকও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে খুব জোরে জোরে বাঁশি বাজাইতে লাগিল, পু—পু—পু—পু—

পাগল মহাতাপ এই কথা শুনিয়া যাহা করিল তাহাকে অসম্ভব কাণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সে অতর্কিতে তাহাব দুই হাতের গুড় বড় বউয়ের গালে মাখাইয়া দিয়া বলিল, তা হলে তোমার গালের আমি চেটে খেয়ে লোব।

রাখাল অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল।—বলিহারি—বলিহারি—বলিহারি!

ঠিক এই মুহূর্তেই গলা পরিষ্কারের শব্দ তুলিয়া সেতাব বলিল, বলি সব হচ্ছে কি? অ্যাঁ! প্রথমেই সে চটিয়া উঠিল রাখালের উপর। বলিল, বলি গুড় খাওয়া হল কবার? রাখাল! বলি হা-হা-হা-হা হাসিই বা কিসের?

রাখাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মহাতাপ, বুঝলে কিনা সেতাব, ও আমাদের কি বলে, ওঃ ভারি আমুদে! ওঃ—

সেতাব রুদ্ধ রোষে ভ্যাঙাইয়া বলিল, ওঃ! ওঃ! ভারি আমুদে! দায়ে করে নিজের গলায় কুপিয়ে আমারও আমোদ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমোদ, আমোদ—

মানদা মহাতাপকে বলিল, তুমি মর তুমি মর।

মহাতাপ দুই হাত নাড়িয়া বলিল, কেয়া, হুয়া কেয়া? আরে, হল কি? বড় বউ স্বামীর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া মহাতাপকে বলিল, কিছু হয় নি, এস, গুড় বের করে বিক্রির কাজটা শেষ কর। বাইরে লোকেরা বসে আছে। সে ঘরে ঢুকিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাদ্র শেষ হইয়া গিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ। পূজার ঢাক বাজিতেছে। 'পূজার ঢাক বাজা' কথাটার মানে পূজার কাজ পড়িয়াছে। পূজার ঢাক সত্য সত্য বাজে বোধনের দিন হইতে। অবশ্য বোধন কোথাও একমাস আগে হয়, কোথাও বা পনেরো দিন, কোথাও বা শুক্লপক্ষের পূর্ববর্তী অমাবস্যায় অর্থাৎ মহালয়ার দিন হইতে। যেখানে যেমন নিয়ম। এখানে বোধনের ঘট আসে মহালয়ার দিন। গ্রামের মধ্যে একখানি পূজা—ওই চণ্ডীমণ্ডপে হইয়া থাকে। কয়েক শরিকের পূজা! বোধনের দেরি আছে। তবুও আশ্বিন পড়িতেই পূজার কাজের ধুম পড়িয়া গিয়াছে পল্লীতে পল্লীতে। কিন্তু আজ ঢাক সত্যই বাজিতেছে। আজ ইঁদপূজা বা ইন্দ্রপূজা। সকাল বেলাতেই ইঁদপূজার স্থানটায় ঢাকী ধুমুল দিতেছে। ইঁদপূজা সরকারী পূজা অর্থাৎ আইনমতে জমিদার মালিক। আইনমতে জমিদার মালিক হইলেও আসল মালিক গ্রামের মণ্ডলেরা। পঞ্চমণ্ডলে পূজার কাজ চালাইয়া থাকে।

তাহারই তত্ত্বাবধান করে, তাহারাই খরচ যোগায়, পরে খরচ জমিদারের খাজনা হইতে হিসাব করিয়া বাদ লইয়া থাকে।

সেতাব ইঁদপূজার বেদীর স্থানটার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মোটা মোড়ল চণ্ডীমণ্ডপের কিনারায় বসিয়া মোটা একটা হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপে একখানি একমাটি-করা দশভূজা প্রতিমা শুকাইতেছে। এখনও মুণ্ড বসানো হয় নাই। কতকগুলা উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে ঘুরিতেছে এদিক ওদিক। তাহার সঙ্গে মানিকও রহিয়াছে। গোবিন্দ রাখালটা তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। মানিককে নামাইয়া দিয়া সে ইন্দ্র-দেবতার বেদীটা গড়িতেছে। দশ-হাত-লম্বা দারুময়-দেহ দেবতাটি একটা বিরাটকায় ফড়িংয়ের মত ঠ্যাং উল্টাইয়া পড়িয়া আছে। মূর্তিটার মধ্যে মূর্তিত্ব নাই, নাক কান চোখের বালাই নাই। দশ-হাত-লম্বা একটা বৃক্ষশাখা, ছালটা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, একদিকের মাথায় ঢেঁকির মত ছোট দুইটা কাঠের সঙ্গে খিল পরাইয়া গাঁথা; ওই ছোট কাঠ দুইটাকে বেদীতে পুঁতিয়া দেবতাকে টেকো দিয়া উন্নত এবং উর্ধ্বশির করিয়া পূজার সময় খাড়া করা হইবে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গ্রাম্য রাস্তা। রাস্তার উপর দিয়া চাষীরা চলিয়াছে। কয়েকটি মেয়ে ঝুড়ি করিয়া লালমাটি লইয়া চলিয়াছে। কয়েকজনের মাথায় খড়িমাটি। তাহারা হাঁকিতেছিল—লাল মাটি লেবেগো, লাল মাটি!

খড়িমাটিওয়ালীরা হাঁকিল—খড়িমাটি চাই, ঘর নিকুবার খড়িমাটি! দুধের মত অং লবেন। খড়িমাটি!

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে খানকয়েক বাড়ির পরে শিবকেষ্ট-রামকেষ্টর বাড়ি। শিবকেষ্টর বাড়ির দাওয়া হইতে টিকুরীর খুড়ী উঁকি মারিয়া মুখ বাড়াইয়া সমান জোরে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল, কি লা? কি?

—মাটি গো, মাটি!

—লাল মাটি, খড়িমাটি।

খুড়ী মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, মাটি গো মাটি! লাল মাটি! খড়িমাটি! মাটি নিয়ে কি বুকে চাপাবে নোকে? মাটি গো মাটি! ঘরে চাল সেজে না,

(অর্থাৎ সিদ্ধ হয় না) লোকে তা বোঝে না। ঘরে ধান নাই, চাল নাই, খাবার নাই; যার ঘরে ধান ছিল লেবি না মেবি করে নিয়ে গেল (লেভিপ্রথা)। যার আছে সে লুকিয়ে রেখেছে। ঘর নিকুবে! লোকে রঙ করবে! মরণ!

—কি খাবি তা আমি কি জানি? আমি কি খাব, পঞ্চায়েত ভেবেছে? জমি দিয়েছে আমাকে? সেই পাপেই হচ্ছে এসব। গতবারে পোকা লেগেছিল ধানে। এবারে শুকোতে যাবে। শুকিয়ে যাবে, ধান ফুলোবে না। ফুললে শুকিয়ে তুষ হবে! আর জল হবে না। আর জল হবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে ধান মরবে। দেখবি! টিকুরীর বউ যেন নাচিতেছিল। সর্বাঙ্গ দোলাইয়া স্বর টানিয়া টানিয়া কথা বলিতেছিল। আনন্দ যেন তাহার ধরিতেছে না।

মাটিওয়ালী মেয়েগুলা তাহার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। একজন ঠিক তাহারই মত স্বর করিয়া বলিল—তা হবে না মোল্যান, আর সিটির জো নাই। ক্যানেল এয়েছে। মৌরক্ষী বেঁধেছে। পাকা দেওয়াল দিয়ে গো, লোহার ফটক বেঁধে। ফটক বন্ধ করলেই জল চলে আসবে।

—আসবে না, আসবে না, আসবে না; ঘোঁতন বলেছে আসবে না। খালের ভেতর গোঙাল পড়ে জল চলে যাবে পাতালে। লয় তো বাঁধ ভেঙে যাবে। লয় তো সি জলে ধান বাঁচবে না। বাঁচলে পচে যাবে, লয় তো পোকা লাগবে। ধান হবে না, তুষ হবে। ঘোঁতন বলেছে।

একটি মেয়ে বলিল, ঘোঁতন ঘোষের অমনি কথাই বটে! বলে, হরিনামের নিকুচি করি আমি।

খুড়ী খ্যাঁক করিয়া উঠিল—ঘোঁতন ঘোষের অমনি কথাই বটে! ঘোঁতন নেকাপড়া জানে। বিদ্যে আছে পেটে। হোত-ত্যা-ত্যা করে না। এক লজরে ধরতে পারে। আমাকে সেদিন বলেছিল, ভাবলী। রেগেছিলাম আমি। হুঁ বাবা। তা ভাবলীই হলাম আমি। ভাজের গায়ে গুড় মাখিয়ে চেটে খায়! মা গো! কোথায় যাব! বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, অ—মা! মহাতাপ আসছে যে।

গোঁত গোঁত করে আসছে দেখ্, বুনো শুয়োর আসছে। অ—মা, হারামজাদী রাঙীকে ধরে আনছে ক্যানে? এই মরেছে! সঙ্গে আবার মোটা মোড়ল।

সে ঘরে ঢুকিয়া গেল। মেয়ে কয়টা এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে শুরু করিল। একজন হাঁকিয়া উঠিল—মাটি চাই মাটি, রাঙামাটি, খড়িমাটি!

মহাতাপ একটা গোরুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল; সোজা টিকুরীর খুড়ীর বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া বলিল, তোমার গোরু আমি খোঁয়াড়ে দিতে চললাম। গোরু ভগবতী না হলে, এ যদি ছাগল-ভেড়া হত তো ওকে মেরেই ফেলতাম আমি।

পিছনে পিছনে মোটা মোড়ল বিপিনও আসিয়াছিল। সে গোরুর দড়িটা হাতে লইয়া বলিল, চেঁচাস নে। যা বলবার আমি বলছি।

—তুমি কি বলবে? আমার এক ভিলি আকের নেতার মেরে দিয়েছে। কিছু রাখে নাই! ওটা গোরু, আর মালিক হল বিধবা মেয়েছেলে; আমি কি করব বল দিকি নি?

নিজের চুলগুলা টানিয়া কঠিন আক্রোশে ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, আমার চুল ছিঁড়ে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার অমন ভাল আক, লকলকে কষকষে হয়ে উঠেছিল—

বিপিন ডাকিল, টিকুরীর বউ! বেরিয়ে এস বাছা। শোন!

টিকুরীর বউ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, কি শুনব? আমি কারু কথা শুনি না। সব মিছে কথা। আমার রাঙীকে আমি কখনও বাঁধি না। দিব্যি মাঠে ঘুরে চরে এসে ঘরে ঢোকে। আমি বিধবা মানুষ, আমি বেঁধে খেতে দিতে পাব কোথা? যারা ফসল আজ্জায়, তারা বেড়া দেয় না ক্যানে? ক্ষেতে যখন যায় তখন হেটহেট করে তাড়িয়ে দেয় না ক্যোনে?

বিপিন বলল, তুমি ক্ষেপেছ না কি? কি সব বলছ—

—ঠিক বলছি। দাও, আমার গোরু দাও। আমি ভাসুর বলে খাতির করব না। আমি মোড়ল বলে মানব না। খোঁয়াড়ে দেবে! অঃ!

সে আগাইয়া গেল গরুটা বিপিনের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইবে বলিয়া। মহাতাপ অবাক হইয়া এতক্ষণ খুড়ীর দাপট দেখিতেছিল। সে এবার হাঁক দিয়া উঠিল, কভি নেহি। দাও, গোরু দাও। বলিয়া ঝটকা মারিয়া দড়িটা বিপিনের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।—খোঁয়াড়ে দোব আমি।

গোরুটাকে সে টানিতে লাগিল।

টিকুরীর খুড়ী গাছকোমর বাঁধিয়া বলিল, ওরে, আমি তোর পরিবারের মত ম্যানমেনে নই। তোর হাঁকারিকে আমি ভয় করি না—

সে আগাইয়া গিয়া মহাতাপের হাত হইতে গোরুটা ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মহাতাপ গ্রাহ্য করিল না। সে টানিতে লাগিল গোরুটাকে। —আয়, আয়।

টিকুরীর খুড়ী বলিয়াই চলিয়াছিল—আমি ঘরের কোণে চোখের জল ফেলব না। লাজের চড় গাল পেতে খেয়ে মনের দুঃখু মনেই রাখব না। আমি দরখাস্ত করব। হ্যাঁ, দরখাস্ত করব। এখুনি ঘোঁতনের কাছে যাব।

তাহার কথা শেষ হইতে হইতে শিবকেষ্ট টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মহাতাপ! ভাই! আমি হাত জোড় করছি, মিনতি করছি। আমাব জ্বর, ঘরে পয়সা নাই, ধানচালও নাই। খোঁয়াড়ে দিলে, ছাডাতে হবে আমাকে। নবগ্রাম হাঁটতে হবে। পয়সা লাগবে। আমার দশা দেখ। গোরুটা ছেড়ে দে ভাই।

মহাতাপ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

বিপিন বলিল, দে, গোরুটা ছেড়ে দে বাবা।

মহাতাপ বলিল, আহা-হা শিবে, তু যে মরে যাবি রে! অ্যাঁ! আহা-হা-হা রে, কি দশা হয়েছে তোর?

শিবকেষ্টর দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা ছিল না, সে উপু হইয়া বসিয়া হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া দুই হাতে মাথা ধরিয়া বলিল, জ্বরে একেবারে হাড় ভেঙে দিলে রে। তিনখানা কাঁথাতে কাঁপন থামে না। গোরুটা ছেড়ে দে ভাই।

খুড়ী আগাইয়া আসিয়া মহাতাপের শিথিল হাত হইতে গোরুর দরিটা টানিয়া লইয়া বলিল, দেবে আর ভাল বলবে। দেবে না?

মহাতাপ গোরুটা ছাড়িয়াই দিল, বলিল, আজ ছেড়ে দিলাম শিবের মুখ চেয়ে। ফের দিনে কিন্তু ছাড়ব না।

খুড়ী বলিল, শিবের মুখ চাইতে হবে না। যার মুখ চাইলে ধর্ম হবে, তার মুখ চেয়ে দেখ-গে! ভাজের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিজের পরিবারের মুখের পানে তাকাগে যা! শিবের মুখ! মরণ!

খুড়ী গরুটা লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন মোড়ল শিবকেষ্টকে বলিল, টিকুরীর বউকে নিয়ে বিপদ হল শিবু! ওকে সাবধান করিস। বলিয়া চলিয়া গেল।—কথাগুলি ভাল কথা নয়।

শিবকেষ্ট মাথার উপর হাতটা উল্টাইয়া দিল। সে কি করিবে?

মহাতাপ হাত বাড়াইয়া শিবকেষ্টকে বলিল, ওঠ্ আমাকে ধরে ওঠ্।

শিবকেষ্ট ধীরে ধীরে উঠিল।

মহাতাপ তাহাকে ঘরে পৌছাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। খুড়ী যেন কি কথাটা বলিয়া গেল! কি ভাজের মুখ! পরিবারের মুখ! কি সব বলিল! শিবকেষ্টর অবস্থা দেখিয়া সে তখন এমনই অভিভূত হইয়াছিল যে, কথাটা ঠিক শুনিয়াও বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। এতক্ষণে কথাটা মনে হইল! কি বলিল? সে হাঁকিয়া ডাকিল---এই, এই খুড়ী, এই বিষমুখী ঠিকুরীর খুড়ী! বলি শুনছ?

খুড়ী ঘরের ভিতর হইতেই উত্তর দিল—কেন রে—ড্যাকরা? বলি বলছিস কি?

—কি বললে কি তখন? আর একবার বল দিকিনি? কি ভাজের মুখ —বউয়ের মুখ—কি বলছিলে?

টিকুরীর খুড়ী হাসিয়া বলিল—তোদের বড় বউয়ের মুখখানি বড় সুন্দর রে, চাঁদের পারা। তাই বলছিলাম। তোর বউয়ের মুখ কিন্তু এত সুন্দর নয়, তাই বলছিলাম। তা বল, অন্যায় বলছি আমি?

মহাতাপ খুশী হইয়া গেল। সে উচ্চ কণ্ঠে সমর্থন করিয়া বলিল,—হাজার বার লক্ষ বার। এ তুমি ঠিক বলেছ! আমি বলি কি বলছ। নাঃ এ তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু এবার গোরু সামলে রেখ। তা বলে গেলাম। সে হনহন

করিয়া মাঠে চলিয়া গেল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর তখন। মাঠ ধানে ভরিয়া উঠিয়াছে। নিড়ান চলিয়াছে। নিদারুণ রৌদ্রের মধ্যে ধানের ক্ষেতে হামাগুড়ি দিয়া আগাছা তুলিয়া চলিয়াছে চাষীরা। দূরে তখনও মাটিওয়ালীদের হাঁক শোনা যাইতেছে।—মাটি, মাটি চাই গো! মাটি, লাল মাটি—খড়িমাটি!

সেতাবের বাড়িতে সেদিন দুপুরে ঢেঁকিতে ছোলা-কলাই কুটিয়া বেসম তৈয়ারী হইতেছিল। বেসম হইতে সেউই ভাজিয়া গুড়ে পাক করিয়া পূজার নাড়ু হইবে। দুইজন ভানাড়ী মেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, ঢেঁকির মুখে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিতেছিল মানদা।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর বেলা, বাড়িটা নির্জন। বড় বউকে দেখা যাইতেছে না। এই নির্জনতার মধ্যে তাহারা গান গাহিতেছে। মানদা গাহিতেছে মূল গান, মেয়েগুলি গাহিতেছে ধুয়া।

মেয়েগুলি ধুয়া গাহিতেছিল—

আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মন তো দুলল না,
ও-তার সিঁথিপাটির লালমানিকের
ছটাতে চোখ খুলল না।
হায় সখি, লাজে মরি লাজে মরি গো।

মানদা গাহিল—

আমার মন যে দোলন খেলে
ও-তার বনমালার দোলাতে।
আমার মন সেই গেল ভুলে,
তারে এসে ভুলাতে।

ভানাড়ী মেয়েগুলি আবার ধুয়া ধরিল—

আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মন তো দুলল না!
হায় লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো

মানদা আবার গাহিল—

মন কাড়িতে এসেছিলাম
মন হারায়ে ঘর ফিরিলাম—
লাজে গলায় চিক মাদুলি পড়ল ছিঁড়ে ধূলাতে !

সঙ্গে সঙ্গে ভানাড়ীরা ধরিল—

হায় লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো !

মানদা আবার গাহিল—

খুলতে গেলাম বাজুবন্ধ বাঁধন যে সেই খুলল না !
ভুলতে গেলাম তারে সখি ভুল যে মোকে ভুলল না !
কালনাগে ধরতে গেলাম—
কালীয়ারে জড়াইলাম—
মরতে গিয়ে অমর হলাম জ্বলতে জ্বলন জ্বালাতে ?
—লাজে মরি লাজে মরি লাজে মরি সখি গো !

রাধাকৃষ্ণের লীলার স্পর্শ জড়াইয়া এমন ধরনের প্রেমের গান বাংলার পল্লী অঞ্চলে কালে কালে কালোপযোগী ভাষায় ছন্দে উপমায় রচিত হইয়া আসিতেছে। এ ভাব পুরানো হয় না। নূতন ভাষায় নবীন হইয়া দেখা দেয়। সকল কালেই পুরবধূরা এ গান—বাউল বৈরাগী পাচালীদল, যাত্রার দলের গায়কদের কাছে শুনিয়া শিখিয়া লয়। কালে কালে এই ভাবে নির্জন দ্বিপ্রহরে গাহিয়া থাকে। ঘরে গাঁয়—ঢেঁকিশালে, ঘাটে গায়—জলে গলা ডুবাইয়া, সখিরা মিলিয়া জল আনিবার পথে গায়।

গানের মধ্যেই দরজায় ধাক্কা পড়িল। কেহ শিকল বাজাইয়া দরজার ও-পাশে সাড়া দিতেছে। মানদা সেদিকে তাকাইয়া বলিল, কে ?

মেয়েলি গলায় সাড়া আসিল, একবার দরজাটা খোল।

মানদা ভানাড়ীদের একজনকে বলিল, দে তো লা খুলে।

মেয়েটি দরজা খুলিয়াই বলিল, অ! পুটি মোল্যান! মানদার দিকে তাকাইয়া বলিল, ঘেঁাতন ঘোষের বুন গো! বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পুটি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিল, ওরে বাপরে! এ যে পূজার ধূম পড়ে গিয়েছে যে! খুব কলাই কুটছ! খুব গান জুড়েছ!

মানদা মুখ মচকাইয়া বলিল, তা কুটছি। কিন্তু তুমি কি মনে করে হে? এই ভত্তি দুপুরে?

—বড় বউ কই? চাঁপাডাঙার দিদি? একটা কথা চলতে এসেছি।

মানদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি কথা হে?

—না ভাই, সে আমি তাকেই বলব। আমার মা বলে পাঠিয়েছে, অন্য কাউকে বলতে বারণ করেছে।

—আমি জানি হে, আমি জানি। গয়না তো? টাকা?

—তা জানবে বইকি ভাই। তুমি অদ্ধেকের মালিক। জানবে বইকি। তবে আমি চাঁপাডাঙার দিদিকে বলে যাই; তুমি তার কাছে শুনো। কই দিদি কোথায়?

মানদা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ধান সেদ্ধ করছে ওদিকের চালায়।

পুটি চলিয়া গেল।

মানদা হাতের কুঁচিগাছটা লইয়া বলিল, ললাটে তিন ঝাঁটা মারতে মন হয়—তিন ঝাঁটা।

বাড়ির আর একদিকে খোড়ো চালায় উনান হাঁড়িতে ধান সিদ্ধ হইতেছিল। ছোট এক টুকরা উঠান, সেখানে সিদ্ধ-করা ধান মেলা রহিয়াছে। একটি মজুর মেয়ে পায়ে পায়ে ধানগুলি টানিয়া ওলট-পালট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চাঁপাডাঙার বউয়ের কাপড়খানা ময়লা, ধোঁয়ায় কালো। গাছকোমর বাঁধিয়া কাপড় পরা। মাথায় ঘোমটা নাই। চুলগুলি রুখু দেখাইতেছে। এখনও স্নান হয় নাই। মুখ-চোখ আগুনের আঁচে এবং এখনও অস্নাত অভুক্ত বলিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। একটু বেশী কালো দেখাইতেছে।

পুটি গিয়া একটু অবাক হইয়াই বলিল, তোমার কি অসুখ করেছে নাকি দিদি? এ কি মুখ হয়েছে তোমার? যেন বড় অসুখ থেকে উঠেছ! সে সকরুণ বিস্মিত দৃষ্টিতে কাদুর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

পুটি ?—পুটিকে দেখিয়া বড় বউ একটু বিস্মিত হইয়া গেল।—এমন অসময়ে ?

—মা পাঠালে তোমার কাছে। কিন্তু—

—সইমা ? কেন রে ? অসুখ শুনেছিলাম সইমায়ের— ; শঙ্কিত হইয়া উঠিল সে। পুটি কি তবে টাকাপয়সার জন্য আসিয়াছে !

—উঠেছে অনেক ভুগে। কিন্তু তোমার এমন চেহারা কেন ?

এবার সলজ্জ হাসিয়া বড় বউ বলিল, উপোস কিনা আজ ! তার উপর—

—উপোস ! ইঁদপূজোর ?

—না, আজ সংক্রান্তি। সংক্রান্তিতে কালীর উপোস করি।

—কালীর কবচ নিয়েছ বুঝি দিদি ? ছেলের জন্যে ?

—হবে না জানি, তবু নিয়েছি। চাঁপাডাঙার বউ হাসিল—বড় বিষণ্ণ সে হাসিটুকু। উপবাসশুষ্ক মুখে ঠোঁটের সে হাসিটুকু অনাবৃষ্টি আকাশের বর্ষণহীন বন্ধ্যা মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুৎরেখার মতই বিশীর্ণ।

পুটি বলিল, তুমি কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখাও না কেন দিদি ? ওই তো বাবুদের গাঁয়ের রবীন বাবুর বউ কলকাতায় গিয়ে কি সব চিকিৎসা করালে—দিব্যি বছর না ঘুরতে ছেলে হয়েছে।

বড় বউ বলিল, ওসব বাবুদের যা হয় তাই কি আমাদের হয়, না সাজে ? এখন কি বলেছে সইমা বল ?

পুটি বলিল—কেন কাদু দিদি, জামাই মোড়লের পয়সা তো অনেক ! বাবুদের চেয়ে কম নয়। তবে কেন হবে না ? না-না, তুমি ধর। তুমি কলকাতা যাও।

কাদু বলিল—টাকা খরচ করবে তোর জামাই মোড়ল ? তার থেকে সে নতুন বিয়ে করবে।

পুটি সভয়ে যেন চাপা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল—না—কাদুদি না।

কাদু হাসিয়া ফেলিল পুটির এমন ভয় দেখিয়া। হাসিয়া বলিল—মরণ ! ভয় দেখ ছুঁড়ির। ভয় নেই, তাও পারবে না তোর জামাই মোড়ল। দুটো বউকে ভাত দিতে হবে না ? তাতে খরচ কত জানিস ?

পুটি স্তব্ধ হইয়া কাদুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাদু হাসিয়াই প্রশ্ন করিল—কি—এমন করে চেয়ে রয়েছিস কেনে?

পুটি বলিল—ব্যাটাছেলেদের জান না দিদি, ওদের ঝোঁক চাপলে—ওরা সব পারে।

—ব্যাটাছেলের খবর তুই এত জানলি কি করে লা?

যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল পুটি। পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—চোখের উপর দেখছি দিদি!

—তোর দাদাকে?

—হ্যাঁ। আরও কত জন দেখছি।

—মরুক গে। যে যা করছে করুক। তোর কেপন জামাই মোড়ল আর যা করবে করুক—এ কাজ করবে না। এখন সইমা কি বলেছে বল।

পুটি তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, কাদুর শেষ কথায় চমকিয়া উঠিল বলিল, একটু আড়ালে চল দিদি।

—আড়ালে? আয়।

পুটিকে লইয়া সে একটা ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি রে?

—জান কি না জানি না; তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার আজকাল খুব মাখামাখি। হঠাৎ অঘটন ঘটেছে যেন। মোড়ল প্রায় যায় দাদার কাছে।

চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। কিন্তু সে বড় শক্ত মেয়ে। মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল—তোর দাদার কাছে যায়? তাতে কি হল? তোর দাদার সঙ্গে এককালে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল বলে, চিরকালই কি আক্রোশ থাকবে না কি?

—তুমি আমার দাদাকে জান না চাঁপাডাঙার দিদি।

—দাদার ওপরে এত রাগ ক্যানে রে? বিয়ে দেয় না?

—মরণ আর কি, বিয়ের জন্যে ভাবি নে। কথাটা কিন্তু আমার নয়, মায়ের। মা বলে দিলে। দাদা বড় মোড়লকে ঠকাচ্ছে। রাখহরি দত্তের ছেলের সঙ্গে জোট করে ফাঁদ পেতেছে। দু ভরির গয়নার ভেতর লোহার

তার ভরে, সীসের টোপা ফেলে, চার ভরি ওজন দেখিয়ে বাঁধা দিচ্ছে। মা বললে—আমার সইয়ের মেয়ে, তারপরে মহাতাপ এবার ধান ছেড়ে দিয়ে উপকার করেছে, তাতে এসব জেনে-শুনে চুপ করে থাকলে আমার ধর্মে সইবে না। তোমার স্বামী সেই লোভে মজেছে দাদার সঙ্গে।

—সে তো ভাই স্যাকরাকে দেখিয়ে শুনিয়ে নেয় নিশ্চয়।

—না। নেয় না! সেই তো! মা বললে—কিসে যে সেতাবকে ও বশ করলে ভগবান জানেন। কাল দুশো টাকা দিয়ে একজোড়া ফারফোরের অনন্ত বাঁধা রেখেছে! তার ভেতরে নাকি দুটো লোহার সরু সিক ভরা আছে। মা নিজের কানে শুনেছে। সে গয়না না ভাঙলে ধরা যাবে না।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, বলব আমি তাকে। সে আসুক।

পুটি বলিল, আমার নাম কোরো না দিদি। দোহাই তোমার! তা হলে দাদা আমাকে—

—তোকে মারে নাকি পুটি?

পুটি হাসিল, বলিল, ও কথা ছেড়ে দাও। আর একটা কথা বলি—

চাঁপাডাঙার বউ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পুটি বলিল, যা করে হোক তোমার স্বামীকে ওর সঙ্গ ছাড়াও। নইলে তোমাদের ঘর থাকবে না। ভেঙে দেবে। নিশ্চয়ই ভেঙে দেবে। বড় মোড়ল আমাদের বাড়ি যায়, গুজগুজ করে দাদার সঙ্গে। আমার ভাল লাগে না। হয় তোমার নিন্দে, নয় ছোট মোড়লের নিন্দে! বড় মোড়ল মধ্যে মধ্যে বলে, ইচ্ছে হয় কি জান ঘোঁতন—ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাই, নয়তো আগুন লাগিয়ে দিই ঘরে। তোমার স্বামী আর সে মানুষ নাই দিদি। তুমি সাবধান হও।

বড় বউ বিস্ফারিত নেত্রে সম্মুখের শরৎকালের গাঢ় নীল মধ্যাহ্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সেখানে ছোটবড় হালকা মেঘের পুঞ্জগুলি ভাসিয়া মন্থরগতিতে যাইতেছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ হালকা দুধের মত রঙের নব লক্ষ গাভীর পাল। আকাশগঙ্গার অসীম-বিস্তার কোমল নীল তটভূমিতে স্বচ্ছন্দ চারণে মন্থরগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রৌদ্রে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ ছুই-একটার গায়ে—একেবারে মাঝখানে হয়তো ঈষৎ কালো রঙের আমেজ। যেন দধিমুখী ধবলী গাইটার পিঠে টুকরাখানেক কালো রঙের বিচিত্র সমাবেশের মত। ছোট ছোট টুকরাগুলা যেন লাল্‌কী বাছুর ; বড় মেঘের টুকরার চেয়ে ওইগুলা ছুটিয়াছে দ্রুততর বেগে। প্রাণের আবেগে পিঠে লেজ তুলিয়া আকাশের অঙ্গনময় দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছে।

বাহিরে একটা গাই ডাকিয়া উঠিল।

সেই ডাকে বউয়ের চমক ভাঙিল। পুটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। গরবিনী চাঁপাডাঙর বউয়ের নিজের মনে হইল—সে এক মুহূর্তে যেন কত গরীব হইয়া গিয়াছে। পুটি তাহার সে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বলিল, আমি যাই, দিদি।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। চাঁপাডাঙার বউ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, পুটি!

পুটি তাহার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া বলিল, কি? চাঁপাডাঙার বউয়ের দৃষ্টি যেন কেমন! ভাদ্রের ভরা দীঘির মত তাহার চেহারা। কূলে কূলে ভরা অথৈ জলতল হইতে যেন কোন একটা জলচারী নড়িয়া উঠিতেছে। সে নড়ায় উপরটায় কাঁপন জাগিয়াছে।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল—অত্যন্ত চাপা স্বরে, আমার স্বামী আর সে মানুষ নাই? আমার নিন্দে করে? কি নিন্দে করে পুটি? আমি কি করেছি? কি বলে?

পুটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, সে ভয় পাইয়া গিয়াছিল ; সভয়ে হাত টানিয়া লইয়া সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি না চাঁপাডাঙার দিদি, আমি জানি না।

সে এক রকম ছুটিয়াই পলাইল। যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, গুজগুজ করে কথা বলে দিদি। শুনতে পাই না। শুনতে পাই না। কিন্তু অনেক কথা, অনেক কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার পর প্রায় এক মাসের উপর চলিয়া গিয়াছে। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। ষষ্ঠীর দিন। চণ্ডীমণ্ডপে যথানিয়মে ঢাকের সঙ্গে ঢোল সানাই কাঁসি আসিয়া পূজার সুর জমাইয়া তুলিয়াছে। দেশে অন্নের অভাব, কাপড়-চোপড় দুর্মূল্য; এসব সত্ত্বেও পূজার সুর একেবারে কাটিয়া যায় নাই। আগেকার কালে এ সুর একটা দেশব্যাপী ঐকতানের ঝঙ্কার তুলিত, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌছিয়া সে গ্রামের বাজনার সঙ্গে সুর মিলাইত। আজ সুর ওঠে, কিন্তু সে সুর ঐকতান তুলিতে পারে না; গ্রামের প্রান্তদেশ পর্যন্ত গিয়া গ্রামান্তরের মধ্যবর্তী মাঠের সীমানার মুখেই এলাইয়া পড়ে। সেদিন বেলা তখন প্রহরখানেক, নবগ্রামের বাজারে কাপড় কিনিতে গিয়াছিল সেতাব। কেনা-কাটা শেষ করিয়া ফিরিবার পথে ঘোঁতনের দলিজায় উঠিল। পুটি সত্য সংবাদই দিয়াছিল; ঘোঁতনের সঙ্গে সেতাবের এখন খুব মাখামাখি। নবগ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-শ্রেণীর অর্থাভাব ক্রমশই দারুণ হইতে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। সকলের আগে এ অবস্থায় তাহারা গহনা বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। প্রাণ ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারে না। ঘোঁতন এই কারবারটায় সেতাবকে ঢুকাইয়া দিতে সাহায্য করিতেছে।

ঘোঁতন বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। কোথায় পূজামণ্ডপে সানাই বাজিতেছে। দাওরার পাশেই একটা শিউলিগাছের তলায় শিউলি ঝরিয়া পড়িতেছে।

সেতাব আসিয়া দাওয়ায় উঠিতেই সে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইল। বিড়ি দিল। সেতাবের বগলে একটি বাণ্ডিল, হাতে একটি পোঁটলা। বিনা ভূমিকাতেই সে ঘোঁতনের হাতে দিয়া বলিল, দেখ দিকি ছেলেগুলার গায়ে হয় কি না।

পোঁটলা খুলিয়া ঘোঁতন দেখিল, কয়েকটা ফ্রক জামা, তুইখানা শাড়ি, একখানা ধুতি, একখানা থান কাপড়, তুইটা ব্লাউজ ও একটা সার্ট। ঘোঁতন বুঝিল, এগুলি তাহার জন্যই লইয়া আসিয়াছে। সে দন্ত বিস্তার করিয়া বলিল, দাঁড়াও, দিয়ে আসি বাড়িতে, বুঝলে।

পোঁটলাটা লইয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

সেতাবের উপু হইয়া বসা অভ্যাস। সে হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া মাথায় এক হাত দিয়া অন্য হাতে বিড়ি টানিতে লাগিল।

পথের উপর দিয়া কয়েকটা গরু লইয়া একটা রাখাল চলিয়া গেল। তাহার পিছনে বহুবল্লভ বাউল একতারা এবং কোমরে গামছা বাঁধিয়া টুংটাং শব্দ তুলিতে তুলিতে যাইতেছিল। বহুবল্লভ সেতাবকে দেখিয়া বলিল, বড় মোড়ল এখানে বসে ?

সেতাব বলিল, বলি তার কৈফিয়ত তোকে দিতে হবে নাকি ?

বহু বলিল, কাপড় কিনতে এসেছিলে ?

সেতাব বিড়িতে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, উঁহু। আকাশের তারা গুনতে এসেছিলাম।

বহু বৈষ্ণব মানুষ, রাগ তাহার নাই ; সে হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, দিনের বেলায় ?

সেতাব বলিল, রেতের বেলা পথে সাপ-খোপ শেয়াল কুকুর ; রেতের বেলা নিজের বাড়িতে তাড়া গুনি। নবগেরামের আকাশের তারা দিনে গুনতে আসাই ভাল।

—তা দিনে তারা দেখবার সময় তোমাদের বটে ! যা ধান জমেছে তোমাদের ! আঃ, যেমন কালো কষকষে রঙ, তেমনি গোছ ! তা মহাতাপ একটা মরদ বটে ! ক্ষ্যামতা ধরে বটে !

সেতাব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ফতুয়ার পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, যা যেখানে যাবি চলে যা। বকর বকর করে কানের পোকা মারিস না আমার। মেজাজ খারাপ করে দিস না।

হরিব-ল—হরিব-ল!—বলিয়া পয়সাটি কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, তা মেজাজ খারাপ হবার কথা বটে! আঃ, আকাশ খাঁ খাঁ করছে। মেঘের চিহ্ন নাই। তোমার উ মাঠে এখনও ক্যানেল আসে নাই। জল না হলে এমন বাহারের ধান সব মরে যাবে। আঃ! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, তা, ভেবো না, হবে জল হবে। এই পুজোতেই হবে জল।

—না, হবে না।

বহু চমকাইয়া উঠিল কথার স্বর শুনিয়া।

সেতাব আবার বলিল, একেবারে শুকিয়ে খড় হয়ে যাবে। জ্বলে যাবে।

বহু বলিল, না না না। হবে। ভগবান তা করবেন না। না না। দেবেন দেবেন। মা ভগবতী আসছেন—ভোগ খাবেন, মুখ ধোবেন না, এই হয়? হে মা, জল দাও। জল দিয়ে সৃষ্টি রাখ মা।

সেতাব বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাওয়ার উপর ঘরের দরজার মুখে গিয়া ডাকিল, ঘোঁতন! ও ঘোঁতন!

বহু আর দাঁড়াইল না, সে চলিয়া গেল।

ঘোঁতন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। সে ইহার মধ্যে নতুন জামাটা পরিয়া ফেলিয়াছে। হাসিয়া বলিল, দেরি হয়ে গেল। চা করতে বললাম। দুধ নাই ঘরে, পুটি গেল দুধ আনতে।

—জামাগুলো গায়ে হল ছেলেগুলার?

—হয়েছে। তোমার চোখ আছে হে!

—তা বউয়ের, পুটির কাপড় পছন্দ হয়েছে?

—বউয়ের হয়েছে, পুটির কথা জানি না। ঝাঁটাখাগী আবার কথা বলে না। ওই এক রকম। বড় বজ্জাত হে!

—না না। বড় কাজের মেয়ে। ভাল মেয়ে।

,—বউ কিন্তু হাসছিল।

—ক্যানে, হাসির কথাটা কি এর মধ্যে?

—সেই চাঁপাডাঙার বউয়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলায় বিয়ের

সম্বন্ধ হয়েছিল, সেই নিয়ে ঠাট্টা করছিল। সতীনের আড়ি প্রেম হল শেষে!

সেতাব একটু হাসিল, তারপর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, তুই ভাগ্যিবান ঘোঁতন। তোর ভাগ্যি ভাল। অনে-ক ভাগ্যি তোর!

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ওই ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি ঘোঁতন, তুই বেঁচে গিয়েছিস।

ঠিক এই সময় ঘোঁতনের মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, ধনে পুত্রে তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক বাবা, কিন্তু এত টাকার জিনিস তুমি না দিলেই পারতে। এমন মিষ্ট কথাগুলি বলিলেও তাহার কণ্ঠস্বর কেমন বিরস। কেমন যেন বেসুর বাজিতেছে।

সেতাব চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, সইমা!

—হ্যাঁ বাবা।

—ঘোঁতনের ছেলে কাঁদছিল দেখে গেলাম, তা বলি—

—তা ছেলেদের দিলেই হত। এই বাজার। তার ওপর, কিছু মনে কোরো না, তোমার ভাই-ভাজ নিয়ে সংসার—

ভাই-ভাজ! সেতাব রাগিয়া উঠিল।—ভাই-ভাজের কি আছে এতে? আমি দোব আমার অংশ থেকে। তার ছেলে আছে। আমার ছেলে নাই, পুলে নাই। আমার খাবে কে? কি করব আমি? কি দরকার আমার যুগিয়ে?

—কাদুকে বলেছ বাবা?

—কাদুকে? চমকাইয়া উঠিল সেতাব। মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, তাহাকেও বলে নাই।

—তুমি বাবা, আমার আর পুটির কাপড় দু জোড়া নিয়ে যাও।

—নিয়ে যাব?

—হ্যাঁ।

—মা! চীৎকার করিয়া উঠিল ঘোঁতন!

মা তাহাতে দমিল না। বলিল—কথা হবে বাবা! স্কুবে নয় হয়েছে।

টিকুরীর বউ—। সে থামিয়া গেল। একটু পর যেন শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল—টিকুরীর বউ আমাকে কাল বলছিল, সেতাব খুব আসছে যাচ্ছে। কনেও খুঁজছে। তা—পুটিকে—। আবারও সে থামিয়া গেল।

সেতাব বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘোঁতনের মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কথাটাই যেন তাহার একান্তভাবে মনের কথা—অথচ এই মুহূর্তের পূর্বেও তাহার মন কথাটি হাতড়াইয়া পায় নাই। হ্যাঁ, সে সন্তান চায়। কাদু বন্ধ্যা; সে তাহার প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত আসক্ত—তাহার প্রতি প্রেম-প্রীতিতে অভিষিক্ত স্ত্রী নয়। কাদু মহাতাপ মহাতাপ করিয়া সারা। তাহার প্রথম যৌবন অর্থোপোর্জনের নীরস কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে উপবাসী রহিয়া গিয়াছে। বহুজনের বঞ্চনায় কৈশোরে সে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া সংসারকে কুটিল অবিশ্বাসী হিসাবেই দেখিয়াছে। ঘোঁতন তাহার মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিয়াছে। টিকুরীর খুড়ী তাহাতে বাতাস দিয়াছে। অবিশ্বাস তাহার জাগিয়াছে। এই লগ্নে পুটি আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়াছে। যুবতী মেয়ে। বিবাহ হয় না। বড় দুঃখী। এই তো—ইহাকে বিবাহ করিলে এ তাহাকে পরম কৃতজ্ঞতায় আঁকড়াইয়া ধরিবে। আজ সব কথাগুলি এক কথায় পরিষ্কার হইয়া গেল। সে বলিতে গেল—চোখ তাহার জলজল করিয়া উঠিল—বলিতে চাহিল—হ্যাঁ। আমি পুটিকে চাই। আমি আমার সব—সব তাহাকে দিব—।

কিন্তু বলা হইল না।

ঠিক এই সময়েই সেতাবের রাখাল গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মোড়ল মশায়, শিগগির আসেন। বাড়ি চলেন।

—ক্যানে রে, কি হল? প্রশ্ন করিল ঘোঁতন।

সেতাব বলিল, কি হবে? নিশ্চয় সেই আমার জন্ম-শত্রু কিছু করেছে। ভাই তো নয়—জন্ম-শত্রু আমার। চিরদিন জালিয়ে খেলে। সেই কিছু করেছে।

—হ্যাঁগো। মাঠে একেবারে ফাটাফাটি লাগিয়ে দিয়েছে। নিজের মাথা ফেটেছে। এই রক্ত পড়েছে। আর মীরবন্ধের শেখেদের দুজনার মাথা ফাটিয়েছে। সেও রক্ত-গঙ্গা। জল নিয়ে মারামারি।

সেতাব চিৎকার করিয়া উঠিল, মরুক মরুক, নয় তো ধরে নিয়ে যাক। আমি জানি না, কিছু জানি না।

বলিয়া হনহন করিয়া অগ্রসর হইল।

এত বড় কাণ্ডটার কারণ যেটি, সেটি শুনিতে সামান্য মনে হয়, কিন্তু চাষার জীবনে তাহা অসামান্য, তাহার গুরুত্ব অনেক বেশী।

কারণ, জল চুরি।

মহাতাপ নিজের মুখেই বলিল, কাল রাত এক প্রহর পর্যন্ত ধরে অমরকুড়ির বেঁকে বাকুড়িতে আল-ছাপু-ছাপু জল করেছি আমি। আঙুল দিয়ে মেপে দেখেছি, আল ছাপাতে দু আঙুল বাকি ছিল। সেই জল চুরি করে নেবে শেখের পো? বললাম, তো বলে—ক্ষ্যাপামি করিস না, বাড়ি যা। চাঁপাডাঙার বউ ভাত বেড়ে রেখেছে, খা গা। ধরলাম টুঁটি চেপে তো হায়দার মাথায় বসিয়ে দিলে পাঁচনের বাড়ি। আমি মহাতাপ! সেই পাঁচন কেড়ে নিয়ে দিলাম দু ভাইয়ের মাথা পিটিয়ে ফাটিয়ে।

মহাতাপ তখন বাড়িতে বসিয়া বড় বউয়ের পরিচর্যা লইতেছিল। ভাল করিয়া রক্ত ধুইয়া গাঁদাফুলের পাতা বাটিয়া চাপান দিয়া ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিতেছিল। মানদা জল দিয়া রক্তাক্ত দাওয়াটা ধুইয়া ফেলিতেছিল।

সেতাব গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মহাতাপের কথা শেষ হইতেই বলিল, বেশ করেছ, খুব করেছ। এইবার ফৌজদারী মামলা হোক। যাও জেলে। একটি পয়সা আমি খরচ করব না। সে আমি বলে দিলাম।

—তা বলে আমার জল চুরি করে নেবে?

—জল চুরির প্রমাণ হয় না কি? জলের গায়ে নাম লেখা থাকে না কি?

—ও জল পেলে কোথা থেকে?

—যেখান থেকে পাক। তুই কোথা পেলি? গাড়োল, মুখ্যু পাগল কোথাকার!

বড় বউ এবার বলিল, দেখ, এমন করে ওকে তুমি যা মুখে আসে তাই বোলো না। তোমাকে বারণ করছি আমি। সহোদর বড় ভাই তুমি, তোমার মুখে এ সব বলতে বাধছে না? ছি-ছি!

মহাতাপ বড় বউয়ের হাত দুইখানি পরম আবেগের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, যার বড় বউ নাই তার কেউ নাই।

মুহূর্তে সেতাব যেন জোর পাইল; সে জ্বলিয়া উঠিল। চাঁপাডাঙার বউকে বলিল, তোমাকেও ছি, তোমাকেও ছি, তোমাকেও ছি! বুঝলে! বলিয়া কাপড়ের বাণ্ডিলটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল কাদু। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্বামীর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মহাতাপকে বলিল, ছাড়, তোমার জন্যে দুধ গরম করে আনি। যাও ঘরে গিয়ে শোও একটু। মান্তু, নিয়ে যা ওকে।

বড় বউ রান্নাশালে আসিয়া উনানে দুধের বাটি বসাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মহাতাপ ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া আপন মনেই বলিল, চামারের নেতার আমি একদিন নিকেষ করে দোব।

পাশের বিছানায় মানিক শুইয়া ছিল। মান্তু তাহার চাপাপড়া হাতখানা সরাইয়া দিতেছিল। চামার কথাটা সে শুনিতে পায় নাই। নেতার মারিয়া দিবে শুনিয়াই সে ভাবিল—তাহাকেই বলিতেছে মহাতাপ। এ সংসারে পোড়াকপালী মানদা ছাড়া এত সহজে নেতার আর কাহার মারিবে সে! চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কার?

—কার আবার, ওই চামারের কেপনের, ওই বড় বউয়ের স্বামীর। ওই আমার দাদার, তোর ভাসুরের।

—তোমাকেও ছি! বুঝলে?

—তোমার নেতারভি এক রোজ মার দেগা। হ্যাঁ!

বড় বউ কথাগুলি সিঁড়ি হইতেই শুনিতেছিল, বলিল, কি যা-তা বলছ? তোমার জন্যে কি আমি শান্তি-স্বস্তি এক দণ্ড পাব না মহাতাপ? নাও, দুধটা খেয়ে ফেল।

—না। দুধ খাব না আমি। ভাত দাও। মছলি আওর ভাত। কাল পলুইয়ে ধরা মাছ আছে। মনে পড় গিয়া। মাছের মাথা আর ভাত। লে আও।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, মান্থ, ভাত এনে দে।

বলিয়া সে ফিরিল। মহাতাপ তাহার আঁচলটা ধরিয়া বলিল, নেহি, উ হামকো ছি করতা। উসকে হাতমে নেহি খায়েগা। তুমি এনে দাও ভাত।

চাঁপাডাঙার বউ বলিল, ছাড়, আঁচল ছাড়।

তাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মহাতাপ আঁচল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, হল কি তোমার, বলতে পার?

—কিছু হয় নি, মাছ আজ ছোঁব না আমি। মান্থ এনে দিক।

বলিয়া নামিয়া গেল।

মহাতাপ চিৎকার করিয়া উঠিল, ছোঁবে না ক্যানে? তুমি বিধবা হয়েছ, না, খড়দার মাঠাকরুন হয়েছ? মাছ ছোঁবে না?

সিঁড়ির মধ্যধাম হইতেই উত্তর আসিল—আজ ষষ্ঠী।

—ষষ্ঠী?

মানদা মুখ বাঁকাইয়া এবার বড় বউ চলিয়া যাওয়ার স্থযোগ পাইয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ষষ্ঠী। ছেলে, বংশধর। চাই না? ছেলের জন্মে কি করছে দেখ না। গলায় এই এক বোঝা মাতুলি। নিত্য উপোস, কানা না কি?

মহাতাপ আজ রাগ করিল না। সে এক মুহূর্তে বিষণ্ণ বেদনায় অভিভূত হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্ফুট স্বরে সে বলিল, ছেলে। সন্তান! সীয়ারাম, সীয়ারাম! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে।

মানদা বলিল, বড় দরদ বড় বউয়ের জন্যে। এইবার বোঝ।

আবার একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহাতাপ বলিল, তুই ঠিক বলেছিস মান্থ, আমি বুঝতে পারতাম না। একটু পর বলিল, আমি তো একটু ক্ষ্যাপাটে বটে! মাথা তো একটু খারাপ!

—একটু? কিন্তু এইবার আক্কেল হল তো?

—হাঁ, হল। আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নেহি। ই হাম নেহি বুঝা!

—এখন যদি বুঝে থাক, তবে সময়ে বিধান কর। বুঝলে?

—কি করি বল্ তো মান্থ ?

—কি করবে ? তাও বলে দিতে হবে আমাকে ? দাদাকে গিয়ে সোজা জিজ্ঞাসা কর, ঘোঁতনের সঙ্গে শলা করে কত টাকার গয়না বাঁধা রেখেছ বল ? এ পর্যন্ত কত টাকার ধান বেচেছ, হিসেব দাও। আমার বিষয়--

বিষয় ?—মহাতাপ ঘৃণাভরা তিক্ত দৃষ্টিতে মানদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, শিব-শিব-শিব ! এতক্ষণ ব্যাড়র ব্যাড়র করে হল বিষয় !

মানদা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। মহাতাপ তাহাকে সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল, বেরিয়ে যা, আমার সামনে থেকে তুই বেরিয়ে যা। আমার সারা অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। বেরিয়ে যা। বিষয় !

বেরিয়ে ?--মানদা ফোঁস করিয়া উঠিল।—বেরিয়ে যাব ক্যানে ? আমি ছেলের মা, এ আমার ছেলের ঘর।

—হাম ছেলের বাবা। আর বেরিয়ে যাবি আর ভাল বলবি। বলিয়া ঘাড়টি ধরিয়া তাহাকে সিঁড়িতে বসাইয়া দিয়া আসিল। আসিয়া মানিকের মাথায় শিয়রের কাছে জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে বড় বউ ক্লান্ত দেহে বিষণ্ণ অন্তরে দাওয়ার উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া ছিল। শুইয়া ছিল ঠিক নয়, অন্তরের দুর্বিষহ আবেগের আলোড়ন সম্বরণ করিবার জন্য উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। সে আর পারে না, পারিতেছে না। এমন সময় মানদা দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া বড় জাকে এইভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় দুরন্ত ক্রোধ যেমন মানুষ সর্বংসহা পৃথিবীর বুকে পা ঠুকিয়া জাহির করে, কখনও বা মাথা ঠুকিয়া নিজের কপাল ফাটাইয়া শান্ত হয়—আঘাত করে মাটিকেই, রক্তাক্ত করে মাটিকেই--তেমনি ভাবেই মানদা বড় জায়ের উপর সব ক্রোধ সব ক্ষোভ দিয়া আঘাত করিল। বলিল, তুমিই—তুমিই আমার কপালে আগুন ধরিয়ে দিলে। তুমি।

বড় বউ তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়াই উত্তর দিল, দিনরাত চোখের জল ঢেলেও যে নেবাতে পারছি না, কি করব বল্ ?

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া বসিল। চোখের জল তখনও গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মান্থ আজ প্রায় ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়াছে। সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, এখন হয়েছে কি? অনেক কাঁদতে হবে। অনেক কাঁদতে হবে তোমাকে।

মানদার চিৎকারেই বোধ করি এক সঙ্গে দুই দিক হইতে সেতাব ও মহাতাপ দুই ভাই আসিয়া হাজির হইল। সেতাব আসিয়াছে বাড়ির বাহির হইতে; মহাতাপ উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। মহাতাপের কোলে মানিক।

সেতাব তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, একদণ্ড শান্তি দেবে না তোমরা? এত অশান্তি কিসের? কাঁদছ? তুমি কাঁদছ? কেন কাঁদছ শুনি?

মহাতাপ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে হঠাৎ গতি সঞ্চয় করিয়া বড় বউয়ের কাছে আসিয়া কোলের মানিককে প্রায় বড় বউয়ের কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই নাও, ছেলের জন্যই যদি এত দুঃখু তোমার, তবে এই নাও। আমার ছেলে তোমাকে দিলাম। নাও।

মানদা চিৎকার করিয়া উঠিল, না-না-না। আমার ছেলে--

মহাতাপ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—না।

সেতাব অধীর পদক্ষেপে আসিয়া বড় বউয়ের কোলের মানিককে তুলিয়া লইয়া মানদা ও মহাতাপের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, না। পরের ছেলে আমি চাই না। ভগবান যদি আমাকে দিয়ে থাকে, তবে সে আমি পাব। আমার হবে।

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বড় বউ তাহাকে ডাকিল, শোন, শোন, যেয়ো না।

কি?—সেতাব ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বড় বউ বলিল, আমাকে তুমি খালাস দাও।

সেতাব বলিল, বাঁচি বাঁচি, তা হলে বাঁচি আমি। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বড় বউ উঠিল এবং খিড়কির পথের দিকে পা বাড়াইল।

মহাতাপ বলিল, কোথা যাবে তুমি?

বড় বউ বলিল, সর। পুকুরে ডুব দিয়ে আসি।

বলিয়া পাশ কাটাইয়া সে বাহির হইয়া গেল। মহাতাপ তাহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়া ডাকিল, বড় বউ!

মানদা বলিল, আদিখ্যেতো কোরো না। ডুবে মরবে না।

মহাতাপ মানদার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোরা সাপের জাত। তোরা সাপের জাত। বিষ ছাড়া তোদের কিছু নাই। জীবনটা জ্বালিয়ে দিলি। বলিস বড় বউকে, তোর কামড় সয়েও ছিলাম। ওর কামড় সইল না। আমি চললাম। এ বাড়িতেই আর আসব না আমি। দু চোখ যেদিকে যায় চলে যাব আমি। হে শিবো! হে ভগবান—

বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

গেল সে খিড়কির পথেই। পুকুরঘাটে তখন বড় বউ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভরা পুকুরের দিকে তাকাইয়া ছিল সে। ডান হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়াছিল গলার কবচ-মাদুলিগুলি।

দূর হইতে মহাতাপ তাহাকে দেখিয়া বলিল, আমি চললাম! আর আমি ফিরব না।

বড় বউ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, কথা বলিতে পারিল না।

মহাতাপ যাইতে যাইতেই বলিল, না। ছেলে—ছেলে তোমার হোক। তাই নিয়ে তুমি সুখে থাক। আমি চললাম। কি দরকার তোমার আমাকে?

সে চলিয়া গেল। বড় বউ দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; তারপর সে সজোরে টান দিল হাতে ধরা কবচের মুঠায়; কবচ-বাঁধা সুতার ডোরটা পট করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। কবচগুলা সে জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেখানে একটা টুপ করিয়া শব্দ তুলিয়া কবচগুলি জলে ডুবিয়া গেল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে নামিল। হাঁটু জলে নামিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইতেছিল।

মহাতাপ দুই চোখ যেদিকে যায় সেই দিকে চলিবার সংকল্প লইয়াই

বাহির হইয়াছিল। আধপাগল মানুষ। সে আজ গভীর আঘাত পাইয়াছে। বড় বউ তাহার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী। দশ-এগারো বছরের কাদম্বিনী শ্বশুর-ঘরে আসিয়া দেওরের সঙ্গে খেলাঘরে খেলা করিত—সে সাজিত মা, মহাতাপ সাজিত ছেলে। কাদাধূলার ভাত রাঁধিয়া দেবরকে খাইতে দিত। উঠানের একটা খাল অংশকে পুকুর কল্পনা করিয়া সেখানে মহাতাপকে স্নান করাইয়া দিত। ছোট আঁজলায় শূন্যকে জল কল্পনা করিয়া তাই মহাতাপের মাথায় ঢালিয়া দিয়া মুখে বলিত—হুপুস হুপুস।

ছেঁড়া ন্যাকড়ায় গা মুখ মুছাইয়া দিত।

এক একদিন মারিত। মহাতাপ কাঁদিত এবং কান্না থামাইয়া হঠাৎ চাঁপাডাঙার বউয়ের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উল্টা মার মারিত।

মহাতাপের মা আসিয়া বলিত, কি হল ?

কাদু লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিত।

মহাতাপ বলিত, আমাকে মারলে।

—তুমি কি করেছিলে ?

—বলেছিলাম ভাত খাব না। ও মা-সেজেছে কিনা !

—ও ! তুমি ছেলে, ও মা !

—মা না কচু ! ছাই ! ছাই ! ছাই !

—না-না-না। ও বলতে নাই, ও বলতে নাই। বড়ভাজ মায়ের মত। মত নয়—মা।

—ওইটুকু মেয়ে আবার মা হয় ?

—হয়। লক্ষ্মণের চেয়ে সীতা বয়সে ছোট ছিলেন। তবু সীতা লক্ষ্মণের মায়ের চেয়ে বেশী। জান ?

শুধু কি এই খেলা ! কত খেলা তাহারা খেলিয়াছে—তাহার কথা একটা পালাগানের চেয়েও বেশি। সে ফুরায় না। লিখিতে গেলে রামায়ণ মহাভারত হইবে বোধ হয়, বলিতে গেলে রাত ফুরাইয়া যায়। এইভাবে একসঙ্গে কতদিন কাটিয়াছে। তাহার উপর এতদিন নিঃসন্তান অবস্থায় মহাতাপকে নিবিড় ভালবাসায় জড়াইয়া থাকিয়া, আজ হঠাৎ সে ভালবাসাকে

খাটো করিয়া তুচ্ছ করিয়া সন্তান-কামনাকে বড় করিয়া তোলার সংবাদে মহাতাপ মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছে।

সে নিজেদের স্বজাতি জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পাড়া বাদ দিয়া আসিয়া উঠিল গ্রামপ্রান্তে বাউরীদের পাড়ায়।

বাউরীপাড়া পার হইয়া আসিয়া উঠিল মাঠের প্রান্তে।

আশ্বিন মাসে ধানের জমিতে কানায় কানায় জল প্রয়োজন। কিন্তু সারা আশ্বিন জল নাই। মাঠ শুকাইয়া গিয়াছে। মাঠের মধ্যে উৎকণ্ঠিত চাষীরা কোদাল কাঁধে ফিরিতেছে। মহাতাপের ওই মাঠের মধ্যেই ঘুরিবার কথা! এই সকালবেলাতেও সে ঘুরিয়াছে; মারপিট করিয়া মাথা ফাটাইয়াছে। কিন্তু আর তাহার সে ইচ্ছা নাই। পাগল, মাঠের সীমানার প্রান্তে একটা গাছে চড়িয়া ডালে বসিয়া পা ঝুলাইয়া গান ধরিল—

"এ সংসারে কেবা কার মন,
  কেবা তোমার তুমি বা কার?
আমার আপন জনা যে জন
কে জানে হায় ঠিকানা তার?"

দুই কলি গাহিয়াই তাহার কি মনে হইল; সে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল এবং হনহন করিয়া আলপথ ধরিয়া হাঁটিয়া আসিয়া নিজের জমিগুলি যেগুলিতে সে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া দুনীতে তুলিয়া জল ভরিতেছিল, সেই জমিগুলির বাঁধ পায়ে লাথি দিয়া ভাঙিয়া দিল। জল বাহির হইতে লাগিল। সে সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল—বিষয়! বিষ—বিষ! যা! বিষ বেরিয়ে যা! ধান মরে যাক! মরে যাক!

চারিপাশে মাঠেও চাষীরা অবাক হইয়া গেল। ছোট মোড়লের এ কি মতি? ইহাদের অধিকাংশই মজুর-শ্রেণীর লোক, ধান বাঁচাইবার জন্য মাঠে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়াছে। পুকুরে পুকুরে দুনী বসাইতেছে। নালা কাটিতেছে। খাওয়া-দাওয়া মাঠেই। মাঠেই রাত্রি কাটিবে। কড়া পচাই মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতেছে, কড়া তামাক টানিতেছে আর খাটিয়া চলিয়াছে। মহাতাপদের কৃষাণ নোটনও মাঠে ছিল। সে ছুটিয়া আসিল।

সে মদের হাঁড়িতে চুমুক দিতেছিল ; সেটা হাতে করিয়াই সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছোট মোড়ল! ছোট মোড়ল!

মহাতাপ বলিল, যাক যাক, বিষ বেরিয়ে যাক।

নোটন হাঁড়িটা আলের উপর রাখিয়া ভাঙা আল বাঁধিতে লাগিল। মহাতাপের নজর পড়িল হাঁড়িটার দিকে। সে হাঁড়িটা তুলিয়া নাক সিঁটকাইয়া মুখটা ঘুরাইতে বাধ্য হইল। আবার জোর করিয়া মুখ ফিরাইল। সে খাইবেই।

নোটন সবিস্ময়ে বলিল, কি, হচ্ছে কি? মদ খাবা নাকি?

—খাব। খাব।

—এই দেখ, বাড়িতে বকবে।

—বাড়ি? আমি আর বাড়ি যাব না।

বলিয়া চুমুক দিল ভাঁড়ে।

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা তুলিয়া মোড়লেরা একদিকে পূজার আয়োজন করিতেছিল, অন্যদিকে জমিতে জলের কথা হইতেছিল।

বিপিন, সেতাব, রামকেষ্ট এবং আরও মোড়লেরা বসিয়া আছে। ঘোঁতনও আসিয়া জুটিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে টিকুরীর খুড়া এবং আরও দুই-তিন জন প্রবীণা মিলিয়া কেহ ঝাটা বুলাইতেছে, কেহ পূজার বাসনগুলিতে জল বুলাইতেছে অর্থাৎ ধুইতেছে। একজন খড়ের দড়িতে আমের শাখা পরাইতেছে। গোটা কয়েক ছেলে রঙীন কাগজ কাটিয়া শিকল তৈয়ারী করিতেছিল। একজন একখানা কাগজে মোটা হরফে লিখিতেছিল— যাত্রাভিনয়। এক পাশে বসিয়া ছিল ঘোঁতন।

বিপিন বলিতেছিল, তা পূজার কটা দিন যাক। তারপরেতে ক্যানেল আপিসে চল। জল যখন আসছে ক্যানেলে, তখন মাঠে এখনও খাল আসে নাই বলে জল দেবে না, ই তো হয় না। জল দেক। আমরা কোন রকমে নিয়ে আসব।

ঘোঁতন বলিয়া উঠিল, সে দেবে না। পরম বিজ্ঞভরে সে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

বিপিন ঘাড় ঘুরাইয়া ঘোঁতনকে দেখিয়া বলিল, কে বটে? ঘোঁতন! ই তাই বলি এমন বিজ্ঞ মানুষটা কে? ইউনিয়ন কোর্টের উকিল কি না? আইন একেবারে ঠোঁটস্থ। দেবে না! ক্যানে দেবে না? তুই এখানে কোথা? অ্যাঁ?

সেতাব বলিল, ও আমার কাছে এয়েচে।

—তোমার কাছে! তা বেশ। এসেছে বেশ করেছে! তা ই সব কথার মধ্যে ও ক্যানে? আমাদের কথা আমরা বুঝব। সব তাতেই ওর পাক মারা চাই। দেবে না! চল সব জোট বেঁধে যাই। বলি, ক্যানেল যখন ধান বাঁচাবার জন্যে, তখন ক্যানে দেবেন না মশায়? না কি হে?

রামকেষ্ট শিবকেষ্ট এবং অন্যান্য মোড়লেরা সায় দিয়া বলিল, সেই কথাই ভাল। গেরামসুদ্ধ লোক যাবে—

সেতাব উঠিয়া পড়িল। তাহার এসব ভাল লাগিতেছে না। তাহারও সংসার বিষ হইয়া গেছে।

সে ডাকিল, ঘোঁতন!

ঘোঁতন উত্তর দেবার পূর্বেই বিপিন বলিল, উঠলে যে সেতাব?

—কি করব? আমার জলে দরকার নাই। মরে যাক ধান, জ্বলে যাক মাঠ। যা হবে হোক। বুয়েচেন?

শিবকেষ্ট বলিল, সেতাবের জমিতে জল আছে। সে মহাতাপ করে রেখেছে আগে থেকে। ওর ভাবনা নাই।

ওহে!—বলিয়া সেতাব চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপরই কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল। বলিল, যাক সে সব কথা। আমার কথা আমার মনেই থাক্। বলিয়া সে খানিকটা চলিয়া গেল। কিন্তু একটা কথা মনে হতেই সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আর একটা কথা জ্যেঠা। আমার পরিবার তো পূজার বরণের ডালা ধরে; তা এবার অন্য লোক দেখুন। সে ধরবে না।

ওদিক হইতে টিকুরীর খুড়ী সর্বাগ্রে বলিয়া উঠিল, তা ভাল, তা ভাল বাবা। আমরা বলতে পারছিলাম না। এ সুমতিটি ভাল হয়েছ তোমার।

বিপিন দৃঢ়স্বরে বলিল, কি, বলছ কি গো টিকুরীর বউমা?

—ন্যায্য কথা বলছি। মোড়ল কি কালা না কি? কানে কথা যায় না?

—না। যায় না। অন্যায় কথাগুলান বোলো না।

সেতাব বলিল, ন্যায় অন্যায় বিচারে কি কাজ জ্যেঠা? তার দেহ ভাল নয়, মন ভাল নয়—

—ক্যান রে! মন ভাল লয় ক্যানে? মহাতাপ নিজের ছেলে বড় বউকে দিয়েছে শুনলাম, তবু মন ভাল লয়? বাবা রে, দেওরের কি ভালবাসা?

খুড়ী!—সেতাব কঠিন স্বরে বাধা দিয়া বলিল, মহাতাপের ছেলে আমি নেব ক্যানে? আমার কপালে থাকে—

—হবে না রে বাঁজার ছেলে কার্তিক ঠাকুরের বাবা এলে। চাঁপাডাঙার বউয়ের কোঁক ফলবে না।

বাধা দিয়া সেতাব বলিল, চাঁপাডাঙার বউয়ের কপালের নেকনই তো একটি নেকন নয় খুড়ী। আমার কপালের একটা নেকনও তো আছে!

সেতাব হনহন করিয়া পথে নামিয়া গেল। ঘোঁতন বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও!

সে সেতাবের সঙ্গ লইয়া বলিল—আচ্ছা কথাটা তুমি বলেছ! ঠিক বলেছ! পরের ছেলে নিয়ে নিজের সাধ মেটে? মেটে না। মেয়ের অদেষ্ট আর পুরুষের অদেষ্ট এক নয়। বিয়ে করবে তুমি পুটিকে? দেব। আমি দেব। বল তুমি।

সেতাব কথা বলিতে গেল কিন্তু পারিল না। অন্তর তাহার লালায়িত। কিন্তু চাঁপাডাঙার বউ! চাঁপাডাঙার বউ! সে? ওঃ সে যেন পাগল হইয়া যাইবে!

ঘোঁতন পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে একটা মুখে গুঁজিয়া একটা সেতাবকে দিল, বলিল—খাও।

—সিগারেট?

—হ্যাঁ। লাও ধরাও।

সে দেশলাই জ্বালিল।

ঘোঁতন আবার বলিল—ওই যে বললে, ন্যায় অন্যায় বিচারে কাজ কি জ্যাঠা? খুব বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ। কথাটা যখন পাঁচজনে বলছে, সন্দেহ যখন—

সেতাব বলিল—চুপ কর ঘোঁতন! চুপ কর। ওরে তুই চুপ কর। সে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

পথে নামিতেই দেখা হইল নোটনের সঙ্গে। নোটন বলিল—বড় মুনিব! ছোট মুনিব—

—ছোট মুনিবের কথা আমি কিছু জানি না। সে চলিতেই লাগিল।

—সে চলে গেল—

নোটনও সঙ্গ ধরিয়া পিছন হইতে কথা বলিতেছিল। মহাতাপ মদ খাইয়া মাঠ হইতে চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, সে বিবাগী হইবে। নোটন কোনমতেই তাহাকে ফিরাইতে পারে নাই।

—যাক—যাক—যাক।

—ওগো, নেশা করে—

—করুক, মরুক; উচ্ছন্নে যাক, চুলোয় যাক। যা বলবার বল্‌গা বড় বউকে।

—তিনি কথা বললে না।

—তবে ছোট বউকে বল্‌গা।

—সেও বললে, জানি না।

—আমিও জানি না। বুঝলি! আমিও জানি না।

সেতাব আর কথা না শুনিয়া হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।

ঘোঁতন ডাকিল, দাঁড়াও হে। দাঁড়াও।

সেতাব যেন ছুটিয়া পলাইতে চাহিতেছে। কোথায় সে তাহা জানে না।

মহাতাপ তখন প্রান্তরের মধ্যে একটা গাছতলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নেশায় সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বাড়িতেও সেই অবস্থা। বড় বউ তেমনি ভাবে উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। ছোট বউ

আপনার ঘরে মানিককে লইয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। শরতের আকাশ নীল, মেঘের দুই-একটা টুকরা মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া যাইতেছে। বৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই।

অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিল। তবু বড় বউ উঠিল না, মানু বাহির হইল না, মহাতাপ ফিরিল না, সেতাবও সেই গিয়াছে—এখনও ফেরে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নির্মল নীল শরৎ আকাশের ষষ্ঠীর চাঁদের জ্যোৎস্না উঠানে ঘরের চালে গাছের শাখায় পল্লবে স্বপ্নলোকের শোভা জাগাইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে আলো যেন স্বপ্নে দেখা রহস্যপুরীর আলোর মত স্পষ্ট অথচ আবছা, আবছা অথচ স্পষ্ট। আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ, সন্ধ্যাতেই একেবারে সিকি আকাশ পার হইয়া ফুটিয়া উঠে। যেন আকাশের নীল সায়রের তলা থেকে মাথা তুলিয়া হাসিতে থাকে। চাঁদের আশেপাশে তারা ফুটিয়া। অসংখ্য—সংখ্যা নাই, সীমা নাই, এক তারা উঁকিঝুঁকি, দুই তারা ঝিকিমিকি, তিন তারা ঘোর নামে, চার তারা পাখি থামে, পাঁচ তারা পঞ্চদীপ, ছয় তারা শাঁখ বাজে, সাত তারা সাতভেয়ে, আট তারা অরুন্ধতী, ন তারা অন্ধকার, দশ তারাতে একাকার—গুনিতে গুনিতে দশ তারা ফুটিতেই অগুন্‌তি তারা ফুটিয়া উঠে, আর গণনা করা যায় না। তাই উঠিল। তবু মণ্ডলবাড়িতে কেহ উঠিল না, আলো জ্বালিল না, রান্না চড়াইল না, বাহির দুয়ার খোলা হাঁ-হাঁ করিতে লাগিল। ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আবাহন অভিষেক হইয়া গেল; ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি বাজিয়া থামিয়া গেল। সেতাব সেখানকার কাজ সারিয়া এতক্ষণে বাড়ি ঢুকিল। ষষ্ঠীর আবছা জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ বাড়িখানা যেন শোকাতুর সদ্য বিধবার মত বিষণ্ণ নির্বাক হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া বসিয়া আছে। সেতাব ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এ কি।

কেহ উত্তর দিল না।

সেতাব আরও চটিয়া বলিল, বলি কাণ্ড-কারখানাটা কি? ঘরে আলো নাই! উনোন জ্বলে নাই, ষষ্ঠীকৃত্যের দিন। শুভদিন। সব্ব মরেছে নাকি?

বড় বউ দাওয়ার উপর শুইয়া ছিল ; সেতাব তাহাকে এতক্ষণে ঠাওর করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—শুনতে পাও না ?

কাদু ক্লান্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওগো! আর আমি পারছি না। আমাকে তুমি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ভাল। দেব। তাই দেব। ভাল করেই দেব। তাই হবে।

বলিয়া সে উপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

—একটা কথা বলি। যতক্ষণ আছি ততক্ষণ বলতে হবে।

—কি ?

—মহাতাপ সেই দুপুরে না খেয়ে চলে গিয়েছে। সেই ফাটা মাথা নিয়ে। এখনও ফেরে নি।

—তার কথা আমি জানি না।

—তোমার মায়ের পেটের ছোট ভাই।

—আমার শত্রু ; তা ছাড়া সে কচি খোকা নয়।

—জেনেশুনেও এ কথা বলছ তুমি ?

—বলছি! বলছি! বলছি! সে আমার শত্রু, তুমি আমার শত্রু, ঘর দোর সব আমার বিষ। আগুন। শ্মশান।

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের দরজটা বন্ধ করিল এবং হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

মানদা আপনার বন্ধ ঘরের দরজার গায়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। বাঘিনীর মত চোখ দুইটা তাহার ক্রোধে জ্বলিতেছিল—এবং সে ক্রোধের সবটাই গিয়া পড়িতে চাহিতেছে ওই বড় জায়ের উপর। সেই তাহার অদৃষ্টকে ওই মহাতাপের মত পাগলের অদৃষ্টের সহিত জড়াইয়া দিয়াছে। গরীবের মেয়ে সে। সেই দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাহার পিতৃ-কুলের জাতিকন্যা হিসাবে হিতৈষিণী সাজিয়া স্বচ্ছল অবস্থার লোভ দেখাইয়া মহাতাপের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে তাহার বাপকে রাজী করাইয়াছিল। প্রথম প্রথম বড় বউয়ের স্নেহ যত্ন, মহাতাপের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা মানদার

ভালই লাগিত। ক্রমে ক্রমে চোখ খুলিয়া সে আজ দিব্য দৃষ্টি পাইয়াছে। বুকের ভিতর তাহার আগুন জ্বলিয়াছে। সেই আগুন চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়া বাহির হইয়া সব কিছুকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতে চাহিতেছে! আজ এই দুর্গাষষ্ঠীর দিন তাহার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, একটি সন্তান তাহার, তাহাকে মহাতাপ দান করিয়া দিল ওই বন্ধ্যা নারীকে! বন্ধ্যা নারীর দৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল, আকর্ষণ দুর্নিবার। ইহার জন্য যদি—

সে আর ভাবিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া মানিককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, হে মা ষষ্ঠী! পাগল মানুষ মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে বলেছে—দান করলাম ছেলে। আমি বলি নাই মা, আমি বলি নাই। হে মা! রক্ষা করো তুমি।

সে ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল।

আপন ঘরে সেতাব উত্তেজিত মনে অন্ধকারেব মধ্যে চালের কাঠের দিকে চাহিয়া জাগিয়া ঘুমন্তের মত পড়িয়া ছিল। মনে মনে তাহার অনেক আলোড়ন, অনেক চিন্তা, অনেক কল্পনা।

বাহিরের পথে চৌকিদারের হাঁক উঠিল। ও—ওই---

কয়েক মিনিট পর চৌকিদারটা বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল---বড় মোড়ল! বড় মোড়ল!

সেতাব হাঁকিল—হ্যাঁ, জেগেছি।

চৌকিদারটা বলিল, তোমাদের ছোট মোড়ল, ওই খিড়কির পুকুরের গাছের তলায় বসে কাঁদছে।

—কাঁদুক। তুই যা!

তবু সেতাব উঠিয়া বসিল।

কথাগুলা মানদাও শুনিয়াছিল। সেও উঠিয়া বসিল।

সিঁড়ি বাহিয়া নামিবার মুখেই শুনিল, একটা দরজা খুলিয়া গেল।

দরজা খুলিয়া সেতাব দাওয়ায় আসিয়া দেখিল, বাহিরের দরজাটা খোলা।

দরজা খুলিয়া বড় বউই বাহির হইয়াছে। কি করিবে সে? দুর্নিবার প্রাণের আকর্ষণ লঙ্ঘন করিতে সে পারিয়া উঠে নাই। সেই গভীর রাত্রে

একাকিনী নারী অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া পুকুরের ধারের গাছতলাটিতে আসিয়া মহাতাপের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, ওঠ।

মহাতাপ বলিল, না—না। আমাকে তোমার দরকার নাই। তোমার সব মিছে কথা।

—না—না। কোন মিছে কথা নয়। মিছে নয়—নয়—নয়। হল তো? ওঠ এখন।

—আমাকে ধর। আমি নেশা করেছি। মদ খেয়েছি।

—শুনেছি। নোটন বলেছে আমাকে।

—আমাকে বকবে না?

—তোমার দোষ কি? সবই আমার অদৃষ্ট! ওঠ, আমার কাঁধ ধরে ওঠ।

মহাতাপকে সে ধরিয়া তুলিল। মহাতাপ তাহার কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল, জান, আমি বিবাগী হয়ে চলে যেতাম! কিন্তু ফিরে এলাম—

বড় বউ অন্ধকারের মধ্যে একটু হাসিল।

পাগল বলিল, তোমার জন্যে ফিরে এলাম—

আর একপাশের অন্ধকার হইতে সেতাব বলিয়া উঠিল, তুমি আর আমার বাড়ি ঢুকো না, আমি বারণ করছি। ঠাই না থাকে তো গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মর।

বড় বউ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পর-মুহূর্তেই সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন সপ্তমীর সকাল।

সুখের রাত্রি সোনার নূপুর বাজাইয়া চঞ্চলা বিলাসিনীর মত অকস্মাৎ পোহাইয়া যায়। কেমন করিয়া কোন দিক দিয়া চলিয়া গেল বুঝা যায় না, ফুরাইয়া গেলে চমক ভাঙে। দুঃখের রাত্রিও দাঁড়াইয়া থাকে না ; বিষণ্ণ ক্লান্তি অসহনীয় হইয়া উঠে, মনে হয় রাত্রির পার নাই, শেষ নাই ; কিন্তু সেও এক সময় ফুরাইয়া যায়। রাত্রি শেষ হয়। সকাল হয়। মণ্ডলবাড়ির সেই দুঃখের ষষ্ঠীর রাত্রিও শেষ হইল। বড় বউ অচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। জ্ঞান হইয়াছে এই সকালবেলা। 'বাড়ি ঢুকো না' এ কথা বলিয়াও সেতাব এই অবস্থায় তুলিয়া না আনিয়া পারে নাই। পথে পড়িয়া মরিতে দিবার মত অমানুষ সে নয়। অবশ্য পথে পড়িয়া মরিবার কথা নয়। মহাতাপ থাকিতে বড় বউ পথে পড়িয়া কখনও মরিবে না। মহাতাপকে সে কাদুকে তুলিয়া আনিতে দিবে না। কখনও না। একদিন সে বড় সাধ করিয়া ঘরে আনিয়াছিল। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিয়াছিল।

সকালবেলা চাঁপাডাঙার বউ চোখ মেলিয়া চাহিল।

মাথার শিয়রে সেতাব দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া ছিল রাখাল ও বিপিন মণ্ডল। জ্ঞান হইতেছে না দেখিয়া রাখাল এবং বিপিনকে সেতাবই ডাকিয়া আনিয়াছে। রাখাল ভাল হাত দেখিতে পারে, বাজনায় যেমন তাহার দক্ষতা, নাড়ীজ্ঞানও তাহার তেমনি সূক্ষ্ম। রাখাল তাহার হাতখানি দেখিতেছিল, চাঁপাডাঙার বউয়ের জ্ঞান হইতে দেখিয়া সে হাতখানি নামাইয়া দিল। বলিল—জ্ঞান হয়েছে, ভয় নাই। কি মা, চিনতে পারছ সব? মনে পড়ছে?

বড় বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

রাখাল বলিল—এই দেখ। তবে নাড়ী বড় দুর্বল। যেন কদিন খায়-

টায় নাই। বুয়েচ না? ভাল করে খেতে দাও। এক বাটি গরম দুধ করে দাও দেখি।

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বড় বউ মৃদুস্বরে বলিল—মোড়ল জেঠার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

—আমার কাছে? বিপিন মোড়ল এ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

—আপনার কাছেই। হ্যাঁ।

—বল মা বল! কি বলছ বল!

—আমাকে একখানি গাড়ি ডেকে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন।

—ক্যানে মা? এই পূজার দিন—

সেতাব আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল—যাবে যাবে; তার জন্যে মোড়ল জ্যাঠাকে ক্যানে? আমিই পাঠিয়ে দোব। হ্যাঁ, দোব। হবে। হবে।

বড় বউ সে কথা গ্রাহ্য করিল না। বলিল—আর আপনারা পাঁচজনে থেকে, ওই মহাতাপকে তার বিষয় ভাগ বুঝিয়ে দেন। সে পাগল। বিষয়-আশয় হাতে পেলে হয়তো বুঝবে, ঘরে থাকবে, নইলে ও ঘরে থাকবে না। বিবাগী হয়ে যাবে।

সেতাব বলিল, হবে, তাও হবে। এই পুজোর ভেতরেই—চুল-চেরা করে ভাগ করে দোব। পঞ্চায়েত ডেকেছি।

বিপিন বলিল, আঃ সেতাব! ছিঃ, তুমিও কি পাগল হলে?

—হয়েছি। হয়েছি। আপনারা সব ভাগ করে দেন। নইলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাখাল ও বিপিন তাহার পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

দাওয়ার উপর তখন মহাতাপ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত দিনের মাথার আঘাতের ফলে এবং সারাদিন অনাচারের ফলে তাহার জ্বর হইয়াছে। এই দেহ লইয়াই কখন বড় বউয়ের চেতনা হইবে—এই প্রত্যাশায় সে দাওয়ায় বসিয়া ছিল। সেখানে বসিয়াই ঘরের কথাগুলি সব শুনিয়াছে। ক্রুদ্ধ উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেতাব এবং বিপিন বাহির হইয়া আসিতেই সে বলিল—হাঁ। আমার বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দাও। ভাগ করে দাও।

সেতাব তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিপিন সে দৃষ্টি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া সেতাবকে ডাকিল—সেতাব! বাবা!

সেতাব মহাতাপকে বলিল, দোব। সেতাব না থাকলে পেতাব মোড়লের জমিজেরাত সব দেনার দায়ে নীলেম হয়ে যেত। ভিক্ষা করে খেতে হত। তা হোক। আমার কর্তব্য আমি করেছি। তোর ন্যায্য ভাগ তুই পাবি।

—ঘোঁতন ঘোষের সঙ্গে মলা করে কত টাকার গয়না বাঁধা নিয়েছ—সে সব হিসেব আমাকে দিতে হবে।

—সে টাকার একটা পয়সা পেতাপ মোড়লের বিষয়ের টাকা নয়। সে আমার পরিবারের গয়না বিক্রি করা টাকা। গাঁয়ের পঞ্চায়েত জানে—বিয়ের সময় পাঁচশো টাকার অলঙ্কার দিয়েছিল শ্বশুর। সে গয়না বেচে দেনা শোধ করেছি। তাকেই আমি বাড়িয়েছি। সে আমার বিয়ের যৌতুক। আমার নিজস্ব।

মহাতাপ বলিল, বড় বউ সে টাকা তোমাকে দেবে না।

মহাতাপ!—চিৎকার করিয়া উঠিল সেতাব।—বড় বউয়ের নাম তুই মুখে আনিস না। তোকে আমি বারণ করছি। তোকে আমি বারণ করছি।

সে হনহন করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সঙ্গে বিপিন চলিয়া গেল। শুধু রাখাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল!

মহাতাপ সেতাবের শেষ কথাটায় খানিকটা দমিয়া গিয়াছিল; কেন সে বড় বউয়ের নাম মুখে আনিবে না? কেন? হঠাৎ সেই প্রশ্নটা তুলিয়া সে উঠানে নামিল—ক্যানে? ক্যানে শুনি? ক্যানে আমি বড় বউয়ের নাম মুখে আনতে পাব না, শুনি?

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মানদা তাহার হাত ধরিল—না, যেতে পাবে না।

উপর হইতে বড় বউয়ের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—মহাতাপ, যেয়ো না, ঘরে গিয়ে শোও। আমার দিব্যি, আমার মরা মুখ দেখবে।

মহাতাপ দাঁড়াইয়া গেল।

এতক্ষণে রাখাল বলিল—ছোট বউমা, চাঁপাডাঙার বউকে একটু দুধ গরম করে দাও বাপু।

ছোট বউ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে মহাতাপের পায়ের কাছে প্রায় পাগলের মত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মাথা খুঁড়ে মরব আমি।

রাখাল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া সে দেখিল, সেতাব বসিয়া পত্র লিখিতেছে। দাঁড়াইয়া আছে নোটন। চিঠিখানা শেষ করিয়া সে পড়িয়া লইল—

কল্যাণবরেষু,

শ্রীমণিলাল পাল অত্র পত্রে ব্যাপার জরুরী জানিবে। তুমি পত্রপাঠ লোক মারফত চলিয়া আসিবে। এখানে তোমার ভগ্নী কিছুতেই থাকিতে পারিতেছে না। আমরা ভায়ে ভায়ে পৃথকান্ন হইতেছি। এ সময় চাঁপাডাঙার বউকে ওখানে লইয়া না গেলে কোন মতেই চলিবে না। তুমি পত্র পাঠ আসিবে। অন্যথায় চাঁপাডাঙার বউকে হয়তো একাই পাঠাইয়া দিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে আমাকে দোষ দিলে চলিবে না। ইতি—

শ্রীসেতাবচন্দ্র পাল

পড়িয়া দেখিয়া চিঠিখানি মুড়িয়া নোটনের হাতে দিয়া বলিল, চলে যা। কাল মণিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। খবরদার, কোন কথা ভাঙবি না।

নোটন চিঠিখানা লইতে হাত বাড়াইল।

রাখাল বলিল, সেতাব!

—ফ্যাচফ্যাচ করিস না রাখাল। পিছু ডাকিস না। বাড়ি যা।

—ওহে, চাঁপাডাঙার বউমাকে—

—রাখাল, তু বাড়ি যা।

রাখাল থামিয়া গেল। ভয় পাইল।

সেতাব চিঠিখানি নোটনের হাতে দিয়া বলিল—তুই সব বলবি। যা ঘটেছে মুখে বলবি। বুঝলি?

রাখাল চলিয়া গেল এবার।

সেতাব আবার বলিল--যাবার পথে ঘোঁতনকে—ঘোঁতনকে বলবি, আমি ডেকেছি। আমি ডেকেছি।

নোটন তবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেতাব বলিল—কি? দাঁড়িয়ে রইলি যে?

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে সানাই ঢোল ঢাক বাজিয়া উঠিল। সপ্তমী পূজার ঘট আনিবার সময় হইয়াছে।

সেতাব আবার বলিল, নোটন!

এবারে নোটন বলিল, ওই শোন, পুজোর ঢাক বাজছে। ঘট আসছে মোড়ল। সে সব বুঝিয়াছে।

সেতাব রূঢ়কণ্ঠে বলিল, নোটন!

নোটন পুরানো লোক, এই ঘরের সুখদুঃখের সঙ্গে তাহার জীবনটা জড়াইয়া গিয়াছে শত পাকে সহস্র বন্ধনে। সে বলিল, যা করবে পুজোর পরে কোরো। মোড়ল, আজ সপ্তমী পুজোর দিন; ঠাকরুনের ঘট আসবে, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী পাতবে, আজ ঘর ভাণ্ডার ধুয়ে তুলো না। বেসজ্জনেব বাজনা বাজিও না।

সেতাব তাহার হাতের চিঠিটা লইতে উদ্যত হইল। বলিল, তুই যাবি কি না বল?

নোটন তাহার হাতখানা সরাইয়া লইয়া বলিল, যাব। তুমি মনিব। কথা শুনতে হবে আমাকে। চললাম আমি। কিন্তু মাঠে ধান মরছে, সোঁ সোঁ ডাক ধরেছে মাটিতে। জল নাই। জল হবে না। আকাশের জল হবে না। এ আমি বললাম তোমাকে। যা হয় কোরো!

সে চলিয়া গেল।

পথে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া তখন বহুবল্লভ বাউল একতারা এবং বাঁয়া বাজাইয়া গান ধরিয়াছিল—

কমল-মুখ শুকায়ে গেছে, আয় মা আয় মুছায়ে দি,
মায়ের কোলে শয়ন কর মা, শীতলপাটী বিছায়ে দি ॥

বল বল মা কানে কানে
কি দুঃখ পেলি কোমল প্রাণে
শ্মশান-তাপে জলছে দেহ,
আঁচল-বায়ে ঘুচায়ে দি।
আয় মা মুখ মুছায়ে দি ॥

আগমনী গানের বাৎসল্য রস অনাবৃষ্টি-শুষ্ক শরতের আকাশের উত্তপ্ত নীলিমাকে সকরুণ করিয়া তুলিয়াছিল।

বড় বউয়ের কানে ওই গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। এ গান যেন দূর-চাঁপাডাঙায় বসিয়া তাহারই মা গাহিতেছে। সে তো যাইবে। এ বাড়ির মেয়াদ তাহার ফুরাইয়াছে। সে কথা সে জানিয়াছে। তাহার নিজের চিত্তের সকল মায়া সব মমতাই কাটিয়াছে। তাহার স্বামীরও কাটিয়াছে। সব ভালবাসা মায়ানদীর মত শুকাইয়া গিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই মরুভূমির বুকের মধ্যে সেতাবের অন্তরের রূপটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চায় নূতন ঘর, নূতন সংসার, নূতন--

হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার মুখে। তাহার প্রতি এই কদর্য সন্দেহ একান্ত ভাবেই মিথ্যা। এতকাল এইভাবেই তো ঘর করিয়া আসিল সে। এমনি ভাবেই তো সে মহাতাপকে স্নেহ করিয়াছে, এমনিভাবেই তো মহাতাপ আবদার করিয়াছে! কই এতকালের মধ্যে এমন সন্দেহ হয় নাই। হঠাৎ আজ, আজ কেন হইল? ওই তাহার নূতন গোপন সাধটা তাহার চোখে ঠুলি পরাইয়া দিয়া সংসারটাকে কালো করিয়া দেখাইয়া তাহাকে জোর দিতেছে।

ঠিক এই সময়েই কে ডাকিল, বউমা!

চমকিয়া উঠিল চাঁপাডাঙার বউ। সে সবিস্ময়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল।

সিঁড়ির নীচে হইতে আগন্তুক কথা বলিল, আমি মা, রাখাল।

চাঁপাডাঙার বউ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

রাখাল উঠিয়া আসিল ; সে একা নয়, তাহার সঙ্গে একটি আট-নয় বছরের মেয়ে। তাহার হাতে এক বাটি দুধ। রাখাল বলিল, তোমার জন্যে দুধটুকু নিয়ে এলাম মা। খাও তুমি। দে মা খেঁদী, খুড়ীমাকে দুধের বাটিটা দে।

চাঁপাডাঙার বউ মাথার ঘোমটাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পূজার ঘট আসছে। আমাকে লক্ষ্মী পাততে হবে। তার আগে তো খাব না!

—মা, এই দেহে তুমি মাথা ঘুরে আবার পড়ে যাবে।

—না! পারব আমি। খুব পারব।

সে ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তুই রাখ্ খেঁদী, আমি লক্ষ্মী পেতে এসে খাব।

রাখাল বলিল, খেঁদী, তুই সঙ্গে যা। বুঝলি, সঙ্গে যা।

ওদিকে ঢাক ঢোল সানাই কাঁসির শব্দ উচ্চ হইয়া উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপে ঘট আসিল। শাঁক বাজিল, উলু পড়িল।

চণ্ডীমণ্ডপে এবার পূজার আয়োজন সবই হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই, সমারোহে জমিয়া উঠিতেছে না। সব যেন বিষণ্ন চিন্তাভারক্লিষ্ট। আকাশে জল নাই, চাষীর দৃষ্টি আকাশের দূর-দিগন্তে, চিত্ত উদ্বেগকাতর। তাহার উপর সেতাবদের এই কলহটাও একটা বেদনাতুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ছেলেরা শুধু ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার মধ্যে মানিকও রহিয়াছে। তাহাকে আনিয়াছে গোবিন্দ। খালি গা, জামাও কেহ একটা পরাইয়া দেয় নাই। সে একটা রঙীন বাঁশি লইয়াই খুশী আছে। সেইটাই সে বাজাইতেছে—পু-পু! পু-পু! বাজাইতেছে আর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মণ্ডলেরা বসিয়া আছে, তামাক টানিতেছে, কিন্তু আসর ঝিমাইয়া গিয়াছে। কেহ বড় একটা কথা বলে না। চেঁচাইতেছে শুধু টিকুরীর খুড়ী।

—অবিশ্বেস, অনাচার, অবিচার—বলি এর চেয়ে পাপ আর কি হবে? বলি ইয়েতে কি ধম্ম থাকে, না দেবতা তুষ্ট হয়। মোড়লেরা কি সব ধম্মজ্ঞান চিবিয়ে খেয়েছে না কি? বলি পূজা করা কেনে?

বিপিন মণ্ডল সোজা হইয়া বসিল। বলিল—টিকুরীর বউ, তুমি এমন করে চেঁচাও ক্যানে গো? বলি এমন করে চেঁচাও ক্যানে গো?

—চেঁচাবে না? বলি মোড়লেরা যে চোখ-কানের মাথা খেয়েছে। বলি সেতাবের বাড়ি থেকে এখনও পুজো এল না, সেদিকে নজর আছে?

পাঁচ আনার অংশীদার সেতাব তখন চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে রাস্তার উপর ঘোতনের সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

বিপিন মণ্ডল বিস্মিত এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসর পূজায় চাঁপাডাঙার বউ ষষ্ঠীর সন্ধ্যা হইতে দশমী পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে সারাক্ষণ হাজির থাকিয়া সকল অনুষ্ঠান নিখুঁত করিয়া নির্বাহ করিয়া দেয়। সেতাবের দৃষ্টিও এদিকে খুব প্রখর। ভাগের ব্যাপারে সে সকল ভাগীর পূজা বুঝিয়া লয়, নিক্তির ওজনে মাপিয়া বুঝিয়া লইয়া ছাড়ে। একুশ সের আতপের নৈবেদ্য বরাদ্দ আছে। সেতাব চণ্ডীমণ্ডপে মাপের সের হাতে করিয়া বসিয়া থাকে। সর্বাগ্রে চাঁপাডাঙার বউ তাহাদের একের তিন অংশের সাত সের আতপ, সোয়া পাঁচ গণ্ডা রম্ভার ভাগ সাতটা রম্ভা, সোয়া পাঁচ পো চিনির সাত ছটাক চিনি, তাহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক পূজার জিনিসগুলি একটি ডালায় গুছাইয়া সাজাইয়া লইয়া আসিয়া নামাইয়া দেয়। সেতাব সব বুঝিয়া লইয়া হাঁকাহাঁকি করে—কই সব, কই গো! ভাগীদাররা সব ঘুমুচ্ছে না কি?

এবার তাহাদের বাড়িতে একটা আকস্মিক কলহ বাধিয়া উঠিয়াছে, তবু পূজা আসিবে না—এ কথা কল্পনা করিতে পারে নাই। চাঁপাডাঙার বউয়ের অবস্থাও বিপিন নিজে দেখিয়া আসিয়াছে; সেতাবও কথার মধ্যে অনেক কিছু বলিয়াছে, তাহার অবশ্য আজ বাহির হইবার কথা নয়, সামর্থ্যও নাই। কিন্তু সেতাব আছে, ছোট বউ আছে।

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—সেতাব!

রাস্তার উপর হইতে সেতাব উত্তর দিল—যাই।

—যাই নয়। বাড়ি যাও। পূজার সামিগ্যিরি আসে নাই। পাঠিয়ে দাও।

টিকুরীর খুড়ী হাঁকিয়া বলিল—তোমাদের ছোট বউকে পাঠিয়ে দিও, বুঝলে বাবা! বড় বউকে পাঠিও না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই চণ্ডীমণ্ডপের পিছন দিক দিয়া প্রবেশ করিল পুটি ও বড় বউ। পুটি স্নান করিয়াছে, বড় বউও স্নান করিয়াছে। পুটির হাতে পূজার সামগ্রীর ডালা। সে আসিয়া ডালা নামাইয়া দিল।

পুটিকে তাহার মা পাঠাইয়া দিয়াছে। পাঠাইয়াছে গুজবের কথাটা বলিতে। বলিয়াছে, লজ্জা করলে চলবে না। বলবি। কাদু আমার পেটের মেয়ের অধিক। কিন্তু কাদুর অবস্থা দেখিয়া পুটি সে কথা বলিতে পারে নাই। বলিয়াছে পুজো দেখতে এলাম দিদি তোমার বাড়ি। কাদু পূজার সামগ্রীর ডালাটা তাহার হাতেই দিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

বড় বউকে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। এত বড় ঘটনা গ্রামে চাপা থাকিবার কথা নয়, সেতাব নিজেই চেঁচামেচি করিয়াছে। ইহার পরও বড় বউ আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবে, এ কথা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

পুটি পূজার ডালাটা নামাইয়া দিল। বড় বউ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল!

সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপটা কয়েক মুহূর্তের জন্য এমন হইয়া রহিল যে সূচ পড়িলেও শুনা যায়।

প্রণাম সারিয়া উঠিয়া বড় বউই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল—আমাদের পুজোর সামিগ্রী। দেখে নাও, কে দেখছ?

এবার টিকুরীর খুড়ী মুখ খুলিল। সে বলিল, আমি দেখে নিচ্ছি, তা—। ডালাটার দিকে একবার তাকাইয়া আবার পুটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাঁপাডাঙার বউকে ছুঁয়েছিস না কি পুটি?

বড় বউ দাঁড়াইয়া বলিল—মোড়ল-বাড়ির ভাঁড়ার এখনও আমার হাতে টিকুরীর খুড়ী। সেখানে লক্ষ্মী পেতে নিজে হাতে সামিগ্রী বার করে সাজিয়ে নিজেই নিয়ে আসছিলাম। পুটি হঠাৎ এসে পড়ল। তুলে নাও। তোমাদের 'না' বলায় হবে না। 'না' বলতে হয় বলবেন ওই দেবতা। বসিয়া নিজেই সমস্ত সামগ্রী প্রতিমার সামনে নামাইয়া দিয়া বলিল—'না' বলতে হয় তুমি বল মা। আর কারুর কথা আমি

শুনব না। আমার হাতের পুজো অশুদ্ধ যদি হয় তবে বজ্রাঘাত কর আমার মাথায়; না হয় সর্পাঘাত হোক আমার। না হয় নিজের হাতের খাঁড়াটা দিয়ে আমার বুকে মার। সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। শুধু বিপিন চিৎকার করিয়া উঠিল—বউ মা! বউ মা! বউ মা!

বড় বউ কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পুটিকে বলিল– চল্ পুটি। তাহারা দুইজনে চলিয়া গেল।

টিকুরীর খুড়ী বলিল – গঙ্গাজলের ঘটিটা কই? অ-ইন্দেশের বউ!

সেতাব রাস্তার উপর হইতে উঠিয়া আসিয়া বিপিনকে বলিল—আজ সন্ধ্যেবেলা তা হলে আমার ভাগের কাজটা সেরে দেন।

—আজ? সেতাব—

—না জ্যেঠা, আজই। আজই! আজই! এ কেলেঙ্কারি আমি আর সইতে পারছি না।

তাহাই হইল।

পঞ্চায়েত বসিয়া সেতাবের বিষয় ভাগ করিয়া দিল। সেতাবের হিসাবের কাজ বড় পরিষ্কার, কাগজপত্রে খুঁত ছিল না; এবং জমিগুলির মধ্যে কোন্ জমি কেমন ইহাও মোড়লদের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। জমি পুকুর ভাগ কাগজ লইয়া বসিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়া গেল।

শেষের দিন বাসন-কোসন ভাগ হইল এবং বাড়ির উঠানে দড়ি ধরিয়া মাপিয়া ঘর ভাগ করিয়া দিল পঞ্চায়েত মণ্ডল। পঞ্চায়েতরা বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। সেতাব মহাতাপ দুই জনে দুই দিকে দাঁড়াইল। মানিক বাঁশিটা বাজাইয়া ফিরিতেছে—পু-পু-পু। বউয়েরা দুইজনেই ঘরের ভিতর।

ভাগের ব্যাপারে সেতাব কথা বলিল না। গোড়াতেই সে বলিয়াছে—আগে ওই বেছে নিক। শেষে আমি ঠকিয়েছি—এ কথা শুনব না।

উঠানে দড়ি ধরিয়াছিল একদিকে রামকেষ্ট অন্যদিকে আর একজন। বিপিন বলিল—বল এখন কে কোন্ দিকে নেবে? এ দিকের ঘরখানা ভাল, তেমনি ওদিকে রান্নাঘর করে নিতে হবে। সেতাব—?

মহাতাপ উঠিয়া আসিয়া বলিল—ভাল ঘর আমি নোব।

সেতাব হাসিয়া বলিল—তাই নেক। আমি পুরনো ঘরই নিলাম।

মহাতাপ নূতন ঘরের দাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া বলিল—বাস্।

সেতাব বলিল, আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি কাঁচা ইট, রাজ-মজুর ঠিক করে রেখেছি। মাটির দেওয়াল দিতে দেরি হবে। ইটের গাঁথনি আজই দেবে।—আয় রে! ওরে! শুনছিস!

কয়েকজন মজুর আসিয়া ঢুকিল। সেতাব বলিল—ওর মুখ আর আমি দেখব না।

মহাতাপ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া বলিল—গয়না যা বাঁধা নিয়েছ তার হিসেব কই? বিপিন জ্যেঠা!

সেতাব বলিল—সে তো আমার বিয়ের যৌতুক!

—সে তো বড় বউয়ের গয়না। বড় বউকে তো ও নেবে না!

—সে আমি বুঝব। তা নিয়ে তোর ওকালতি করতে হবে না।

—আলবাত হবে।

বিপিন বলিল—মহাতাপ, তুমি মিছে চেঁচামেচি কোরো না।

ঠিক এই সময়েই বড় বউয়ের ভাই মণিলাল আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। মহাতাপ চীৎকার করিয়া বলিল—ওই, ওই বড় বউয়ের ভাই এসেছে। নোটন আনতে গিয়েছিল।

মণিলাল আসিয়া সেতাবকে প্রণাম করিল। বয়সে বড় বউ অপেক্ষা বছর তিনেকের ছোট। বেশ স্বাস্থ্যবান। চাষীর ছেলে। প্রণাম করিয়া বলিল—এ সব কি বললে নোটন, জামাই-দাদা?

—তোমার ভগ্নীকে নিয়ে আমার ঘর করা অসম্ভব মণিলাল।

বিপিন আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল—সেতাব, এ কাজ তুমি হঠাৎ কোরো না। সেতাব?

—না। সে আর হয় না জ্যেঠা। মণিলাল, তুমি তোমার ভগ্নীকে নিয়ে যাও। গাড়ি আমি ঠিক করে রেখেছি।

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বেশ উল্লাসের সঙ্গেই বলিল—আমিও রেখেছি, গাড়ি ঠিক করে আমিও রেখেছি। হাঁ আমিও মহাতাপ! হাঁ!

সে বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই, যাহাকে বলে দর্পভরে পদক্ষেপ, তেমনি পদক্ষেপে, কর্মরত মজুরওয়ালার কাটা দেওয়ালের ভিতরটার চারিদিকে বেড়াইয়া আসিল। যেন লাঠি-খেলোয়াড় পাঁয়তারা ভাঁজিতেছে। সেই ভাঁজিবার মুখে তাহার চোখে পড়িল মানদা কখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এক ভাগ লইয়া গুছাইতেছে। মহাতাপ থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল—নেহি নেহি নেহি।

মানদা থমকিয়া গেল। তারপর ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় বলিল—কোন্‌টা আমাদের?

ওইটাই। ওইটাই মহাতাপ নিয়েছে।—বলিল বিপিন।

তবে?

মহাতাপ কাছে আসিয়া বলিল,—তোকে ছুঁতে হবে না আমার ভাগ। তুই তোর কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে। হাঁ! গাড়ি ঠিক করে রেখেছি আমি। তোর সঙ্গে আমার ঘর করা নেহি চলেগা। হাঁ!

মানদার হাত হইতে বাসন কয়েকখানা পড়িয়া গেল।

সকলেই চমকিয়া উঠিল। বিপিন বলিল, ওরে মুখ্যু, আধ-পাগল, বলছিস কি? ক্ষেপলি না কি?

—অন্যায় কি বললাম? ক্ষেপব কেন?

—তবে এসব কি বলছিস? নিজের পরিবারকে নিবি না ক্যানে?

—ও নেবে না ক্যানে? ও পাঠিয়ে দেবে ক্যানে?

সকলে অবাক হইয়া গেল।

মহাতাপ বলিল, ওকে পাঠিয়ে দোব আমি। দিয়ে সেই গাড়িতে বড় বউকে নিয়ে আসব আমি। আর নইলে শিবকেষ্ট রামকেষ্টদের টিকুরীর খুড়ী ইন্দেশের খুড়ীর মত বড় বউকে ভাগ করে দাও তোমরা। বড় বউয়ের সঙ্গে ওর বনে না, আমার ছোট বউয়ের সঙ্গে বনে না। ছোট বউ ওর ভাগে যাক, বড় বউ আমার ঘরে থাকবে।

বিপিন বলিল, ছি-ছি-ছি! মহাতাপ তুই চুপ কর্। আর কেলেঙ্কারি বাড়াস নে। বাড়াস নে।

মহাতাপ চীৎকার করিয়া উঠিল—না-না-না বড় বউকে আমি যেতে দোব না। বড় বউ ছাড়া আমার চলবে না!

সেতাব এক টুকরা ভাঙা ইট লইয়া সজোরে ছুঁড়িল।

মহাতাপকে লক্ষ্য করিয়া নয়। ছুঁড়িল বড় বউকে লক্ষ্য করিয়া। বড় বউ কখন আসিয়া সিঁড়ির দরজার মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই। সেতাব দেখিয়াছিল। কাঁচা ইটের টুকরাটা বড় বউয়ের পাশে দেওয়ালে লাগিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিপিন সেতাবের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, এস বাইরে, এস। তাহাকে টানিয়া সে লইয়া গেল। খামার-বাড়িতে আসিয়া সেতাব বলিল, আমি নতুন করে সংসার করব। আবার বিয়ে করব আমি।

—করবে। আর আপত্তি আমি করব না।

—ঘোঁতনের বোন পুটির কথা আমি ঘোঁতনকে বলেছি।

নবম পরিচ্ছেদ

নবমীর রাত্রিকাল। মণ্ডলবাড়ির সম্পত্তি ঘর দুয়ার সবই আজ দিনের বেলা ভাগ হইয়া গিয়াছে।

বাড়ির বাহিরে টাপর-দেওয়া গোরুর গাড়ি সাজানো রহিয়াছে। সকালেই বড় বউ চাঁপাডাঙা যাইবে—চিরকালের মত হয়তো যাইবে।

বাড়ির উঠানে এক-কোমর উঁচু কাঁচা ইটের দেওয়াল গাঁথা হইয়া গিয়াছে। ভারা বাঁধা রহিয়াছে। কাল বাকিটা শেষ হইবে।

সেতাব সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছে তাহার সন্তান চাই। সে আবার বিবাহ করিবে। ঘোঁতন যদি পুটির সঙ্গে বিবাহ দেয় তবে সে আনন্দের সঙ্গে বিবাহ করিবে। তবু তাহার বুকে যেন আগুন জ্বলিতেছে।

কাদম্বিনীর উপর একটা কঠিন আক্রোশ বুকের মধ্যে আগুনের মত জ্বলিতেছে!

রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইয়াছে, জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজ মেঘ দেখা দিয়াছে।

শুইবার ঘরে বড় বউ শুইয়া ছিল। সেতাবও শুইয়া ছিল, কিন্তু ঘুম তাহার আসে নাই। বড় বউকে বিদায় দিব, বিদায় দিব বলিয়া কয়দিন মাতিয়া উঠিয়াছিল; কাল বড় বউ চলিয়া যাইবে, আজ রাত্রে তাহার অন্তর কেমন অধীর অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধ, ক্ষোভ, জ্বালা, বেদনা, দুঃখ—সে যেন সব কিছুর একটা সংমিশ্রণ! যেন আগ্নেয়গিরির গর্ভে ফুটন্ত বহু ধাতুর আলোড়ন। সে হঠাৎ উঠিয়া বসিল, কতদিন থেকে তুমি আমার চোখে এইভাবে ধুলো দিয়ে আসছ, বলতে পার? কতদিন?

বড় বউ উত্তর দিল না। সেতাব ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বলিল, আমার মুখে ক্যানে এমন করে চুনকালি মাখালে, ক্যানে? বলিয়াই দ্রুতপদে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি তো বিষ খাইয়ে আমাকে মেরে যা খুশি তাই করতে পারতে! তারপরই বলিল, গয়না, ওই গয়না কটা দিয়ে বিষয় বাঁচিয়ে তুমি আমায় ঠকিয়েছ। আমি কানা, আমি অন্ধ। তোমাকে তার একটি পয়সা আমি দোব না।

সে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া কাছে গিয়া বসিল, বলিল, তোমাকে যেতে আমি দোব না। তোমার গলা টিপে মেরে ফেলব আমি।

বলিতে বলিতেই সে অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, জবাবও তুমি দেবে না! চাঁপাডাঙার বউ!

এতক্ষণে চাঁপাডাঙার বউ বলিল—বল।

—আমার পা ছুঁয়ে, বল তুমি।

—কি?

—যা দেখেছি তা ভুল। যা বুঝেছি তা ভুল। বল, আমার পা ছুঁয়ে বল? ওঠ।

সে বড় বউয়ের হাত ধরিয়া রূঢ় আকর্ষণে টানিয়া তুলিল এবং নিজের পাখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আমার পা ছুঁয়ে বল?

বড় বউ তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থামিয়া বলিল, না! তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল।

সামনে জ্যোৎস্না-ঝলমল পৃথিবী। আকাশে জ্যোৎস্না, গাছের পল্লবে জ্যোৎস্না। কিন্তু তাহার উপর একটা যেন ছায়া পড়িয়াছে! পূর্ব দিকে দিগন্তে মেঘ উঠিয়াছে, এক কোণে তাহারই ছায়া পড়িয়াছে জ্যোৎস্না-আলোকিত পৃথিবীর উপর। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সে চমক চকিত স্বল্প অস্পষ্ট। ইঙ্গিত—স্পষ্ট প্রকাশ নয়।

শুইয়া শুইয়া কত কথাই তাহার মনে উঠিল। একবার মনে হইল সেতাবের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া পা দুইটাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে—তুমি সত্যিই অন্ধ, তুমি সত্যিই অন্ধ। এই কথাটাই তোমার পা ছুঁয়ে আমি তোমাকে বলছি। আর শেষ মিনতি করছি, মেরেই ফেল আমাকে। মেরেই ফেল। কি করে এই মুখ নিয়ে চাঁপাডাঙায় গিয়ে দাঁড়াব আমি?

সেতাব ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিল। চিন্তায় সে অধীর অস্থির।

চাঁপাডাঙার বউয়ের উপর নিষ্ঠুর আক্রোশ যেন মুক্ত প্রবাহে বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। কোথায় যেন বাধা পাইয়া নিজের বুকে ফিরিয়া আসিয়া ধাক্কা মারিতেছে। কোন মতেই সে অপরাধের পাহাড়টা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না। বড় বউ উপুড় হইয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া পিষিয়া যাইতেছে না! সে জলের ঘটি হইতে জল দিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিল। তারপর শুইয়া পড়িল।

সব স্তব্ধ। রাত্রি শন-শন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য কোটি

কীটপতঙ্গ অবিরাম এক বিচিত্র ঐকতান বাজাইয়া চলিয়াছে। বাহিরে এক সময় একটা প্যাঁচা ডাকিয়া উঠিল। সেতাব চমকিয়া উঠিল। কান পাতিয়া কিছু শুনিবার চেষ্টা করিল। কই বড় বউয়ের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কই? সে সন্তর্পণে বিছানা ছাড়িয়া বারান্দার দিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল।

আকাশের জ্যোৎস্নার আভাস আসিয়া পড়িয়াছে। বারান্দার ভিতরে বারান্দার রেলিংয়ের খানিকটা পাশ পর্যন্ত জ্যোৎস্নাই রহিয়াছে। সেখানে রেলিংয়ের ছায়া পড়িয়াছে। ভিতরটায় আবছা আলো-আঁধারি, তাহারই মধ্যে সাদা কাপড় ঢাকা বড় বউ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে।

সে আবার আসিয়া বিছানায় শুইল। আবার উঠিল, একটা বালিশ তুলিয়া লইয়া জানালার ধারে রাখিয়া শুইয়া পড়িল। বাহিরে দিগন্তে মেঘ ঘন হইতেছে। বাতাস উঠিয়াছে মৃদুমন্দ। সেই বাতাসে তাহার তন্দ্রা আসিল।

হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। পায়ে যেন কিছুর স্পর্শ অনুভব করিতেছে সে! দেখিল, পায়ের তলার দিক হইতে চাঁপাডাঙার বউ সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া পা বাড়াইয়াছে। বারান্দার দরজাটা ঠিক পায়ের কাছেই। বারান্দা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে বড় বউ। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়াছে। সেতাব চঞ্চল হইল না। সে স্থির হইয়া ঘুমন্তের মত পড়িয়া রহিল। বড় বউ নামিয়া গেল। সে উঠিয়া কান পাতিয়া রহিল। সিঁড়ির দরজাটা খুলিয়া গেল। এবার সে উঠিল, ঘরের এক কোণে কয়েকটা জিনিসের সঙ্গে ছিল একখানা দা। সে দাখানা লইয়া নামিয়া গেল।

বড় বউ মহাতাপের ঘরের দিকে যাইতেছে।

মহাতাপ বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া আছে। শুইবার আগে মানদাকে বলিয়াছে, শাসাইয়াছে—না না। আমার ঘরে কাজ নাই। নে, তুই ঘর নে, দোর নে, বিষয় নে, আমি চাই না। এই বাইরে থাকছি রাতটার মত, কাল চলে যাব। নিশ্চয় চলে যাব।

বড় বউ সত্যই মহাতাপের বাড়ির দিকেই গেল। মাঝখানে উঠানে

পাঁচিল পড়িয়াছে। প্রায় হাত দুয়েক উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হইয়া গিয়াছে। বড় বউ সন্তর্পণে পাঁচিল পার হইয়া ওপারে দাওয়ার ধারে দাঁড়াইল। মহাতাপ বারান্দাতেই শুইয়া আছে। বারান্দার গায়ে খোলা দরজার ভিতর মিটমিটে লণ্ঠনের স্বল্পালোকিত ঘরে মানদা মানিককে লইয়া শুইয়া আছে, দেখা যাইতেছে। বড় বউ দাওয়ায় উঠিল। মহাতাপের মাথার কাছে একটি ছোট পুটলি নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বারান্দার ওই প্রান্তে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মহাতাপও ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। বড় বউয়ের দরজা খোলার শব্দে সে জাগিয়া উঠিল, তাকাইয়া দেখিল—একটি মূর্তি বাহির হইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে সবিস্ময়ে বলিল, বড় বউ? সে হাতে ভর দিয়া উঠিয়া গেল। দেহে তাহার জ্বর রহিয়াছে। হাতে একটা কি ঠেকিল। সে সেটা লইয়া টিপিয়া দেখিল।—এ কি? টাকা? গয়না? বড় বউয়ের দ্রুত অনুসরণ করিল। সে বুঝিয়াছে, সে বুঝিয়াছে। বড় বউয়ের মতলব সে বুঝিয়াছে।

সে বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মানদাও বাহির হইয়া আসিল বারান্দায়। খোলা খিড়কির দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল সে। একটু হাসিল, তারপর সে অনুসরণ করিল।

এবার উঠানে নামিয়া আসিল সেতাব। তাহার হাতের দাখানা জ্যোৎস্নায় ঝলকিয়া উঠিল।

মহাতাপ খিড়কির দরজার বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কয়টা গাছের তলায় অন্ধকার, তাহার ওপারে জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবী। ভরা পুকুরটা জ্যোৎস্নায় ঝকমক করিতেছে। চাঁদ পুকুরের জলে চাঁদমালা হইয়া কাঁপিতেছে।

পুকুরের ঘাটে দাঁড়াইয়া বড় বউ।

বড় বউ বসিল। কাপড়ের আঁচলের ফালি ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে

মরিবার জন্য আসিয়াছে। সে জলে ডুবিয়া মরিবে। কাপড়ের ফালি দিয়া পা দুইটিকে বাঁধিবে। বুকের কাপড়ে একখানা ইট। শুইয়া শুইয়া সে অনেক ভাবিয়াছে। ছি! ছি! কোন্ মুখে সে চাঁপাডাঙায় ফিরিয়া যাইবে? লোকে শুধাইলে কি বলিবে?

সে সঙ্কল্প করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় তাহার গায়ের গহনা কয়খানা এবং গোপন সঞ্চয় শ দুয়েক টাকা পুঁটলি বাঁধিয়া মহাতাপের মাথার শিয়রে নামাইয়া দিয়া আসিয়াছে। তাহার ছিল অনেক। সবই স্বামিত্বের দাবিতে সেতাব লইয়াছে। সে একটি কথাও বলে নাই। এই সামান্যটুকু সে মহাতাপকেই দিয়া যাইবে। মহাতাপকে বঞ্চিত করিয়াছে সেতাব।

বড় বউ পায়ে বাঁধন দিতেছিল।

গাছের তলার ছায়া হইতে মহাতাপ আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল —বড় বউ!

চাঁপাডাঙার বউ চমকিয়া উঠিল। তাহার দিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, মহাতাপ!

মহাতাপ বলিল, তুমি জলে ডুবতে এসেছ বড় বউ?

বড় বউ অবোধকে ছলনা করিতে চাহিল—কে বললে? আমি ঘাটে এসেছি ভাই। শরীরটা বড় জ্বলছে। চান করব।

—না।—ঘাড় নাড়িয়া মহাতাপ বলিল, আজ তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। পায়ে তুমি দড়ি বাঁধছ। আমার মাথার শিয়রে তুমি গয়না টাকা ফেলে দিয়ে এলে। আমি তখুনি বুঝেছি।

বড় বউ বলিল, আমি এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে চাঁপাডাঙায় কোন মুখে ফিরে যাব ভাই? তুমি কেন এসে এই সময় সামনে দাঁড়ালে মহাতাপ?

—আমি চলে যাচ্ছি। আমি কিছু বলব না। তুমি তাই মর। ওরা যে এমন ভাবে, তা আমি বুঝতে পারতাম না। তোমার গয়না টাকা তুমি নাও। আঁচলে হাত না বেঁধেই ডুবে মর তুমি। যার পাওনা সে নেবে।

সে ফিরিতে উদ্যত হইল।

—মহাতাপ! দেওর!

মহাতাপ ফিরিল। বড় বউ বলিল, ও তোমার পাওনা। তোমার দাদা তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে।

—আমি নিয়ে কি করব? তুমি ডুবে মর। আমিও চলে যাব ঘর থেকে। তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পথ ধরতাম।

—না, না। ও কথা বলতে নেই। মানুর কি হবে? মানিকের কি হবে।

—সে ওই জানে। —হাতখানা উপরের দিকে তুলিয়া দিল।—তুমি যে ঘরে থাকবে না, সে ঘরে আমি থাকব না।

বড় বউ নিজেও আজ সচকিত হইয়া উঠিল। বিরক্ত হইল। ছি-ছি ছি-ছি। কঠিন কণ্ঠেই বলিল, কিন্তু ক্যানে? ক্যানে তুমি আমার জন্যে ঘর ছাড়বে মহাতাপ? তোমার বউ, তোমার ছেলে, তোমার ঘর, তোমার বিষয়—

—আঃ! তুমিও তাই বলছ? হা-হা-হারে। সে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। তারপর আবার বলিল—শুধু বউ বেটা বিষয় নিয়ে ঘর হয়? মা না থাকলে, মা থাকতে তাকে ছেড়ে বউ-বেটা নিয়ে ঘর? আমার মা বলে গিয়েছে, বড় ভাজ তোর মা। ছেলেবেলায় খেলাঘরে তুমি মা হতে আমি ছেলে হতাম—মনে নাই? বলে নাই লক্ষ্মণের কথা, সীতার কথা?

সে ছবি মুহূর্তে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল; সে কি ভুলিবার?

মনে হইল, সেই সেকালের যুগেই যেন ফিরিয়া গিয়াছে।

মহাতাপ আবার বলিল, মরণকালে মা তোমাকে বলে নাই—বউমা, মহাতাপ আমার পাগল, ও মা ছাড়া থাকতে পারে না—তুমি ওর মা হয়ো? তোমার ছেলে-পুলে হোক, কিন্তু ঐ তোমার বড় ছেলে। বলে নাই? মনে নাই?

—আছে ভাই।

মনে আছে কেন, এই মুহূর্তে চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

শুধু তাহারই নয়, শুধু মহাতাপেরই নয়; সেতাবের চোখের সম্মুখেও

ভাসিতেছে। সে যে তাহার সাক্ষী। মায়ের মৃত্যুকালে মা যখন কথাগুলি বলে তখন সেও যে দাঁড়াইয়া ছিল সেখানে।

একটা গাছের তলায় দা হাতে সেতাব দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল; থরথর করিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল সব-শেষে মা তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—তুমি আমার বটবৃক্ষ। ঝড় বাজ অনেক সহ্য করে পোড়ো মণ্ডল-বাড়িকে খাড়া করেছ। তোমার ছায়ার তলায় এই দুটিকে দিয়ে গেলাম। মহাতাপ পাগলাটে, তাকে বউমা দেখবে। তুমি বড় বউমাকে দেখ। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমার। ওর পয়েই সব। ওর অপমান কোরো না কখনও। ও আমার বড় অভিমানী।

এই নিশীথে গাছের ছায়ার মধ্যে সেই ছবি যেন স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল।

ওদিকে আকাশে শন-শন করিয়া মেঘ উঠিতেছিল, কখন মেঘ জমিয়াছে—পাক খাইয়াছে; গুমোট ধরিয়াছে—তাহার পর মৃদু বাতাস উঠিয়াছে, মৃদু বাতাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ ধাবমান হইয়াছে—আকাশ ঢাকিয়া অসীম বিস্তারে প্রসারিত হইতেছে। মেঘে মেঘে সংঘর্ষ বাধিয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইয়া একটা মেঘগর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গম্ভীর গুরু গুরু দীর্ঘায়িত মনোহর মেঘধ্বনি।

মহাতাপ বড় বউকে বলিল, তুমি তাই মর মা; মা-ই বলছি আজো। তুমি মর আমিও চলে যাচ্ছি—এই পথেই যাব। একেবারে গঙ্গাসাগর।

বড় বউ বলিল, মহাতাপ! না। সে কোরো না ভাই!

—না নয়। আমি ঠিক করে রেখেছি। তুমিই কি কম দুঃখ দিলে আমাকে? আমাকে নিয়ে তো ছেলের সাধ মেটে নাই তোমার! কত কবচ পরলে, কত উপোস করলে! গঙ্গাসাগরে ডুবে মরব আমি। যেন আসছে জন্মে তোমার কোলেই জন্মাই আমি।

বড় বউ চিৎকার করিয়া উঠিল, আমার মাদুলি আমি ছিঁড়ে জলে ফেলে দিয়েছি।

একেবারে বাধাবন্ধনহীন চীৎকার—ওই মেঘের ডাকের মত।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে শিশুকণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইল—ব-মা! ব-মা!

বড় বউ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মানিক!

ওদিকে একটা গাছের ছায়ার তলা হইতে মানদা চীৎকার করিয়া উঠিল, মানিক!

মানিককে যে সে ঘরে একলা রাখিয়া আসিয়াছে! বাড়ির দরজাগুলা যে খোলা হাট হইয়াছে! মানিক!—বড় বউ উঠিতে গেল। কিন্তু পায়ের বাঁধনের জন্য পারিল না, পড়িয়া গেল। সে বলিল, মহাতাপ, মানিককে দেখ। মহাতাপ! আঃ, আমার পায়ের বাঁধনটা, আঃ!

দা হাতে গাছতলা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল সেতাব।

মহাতাপ চীৎকার করিয়া উঠিল, না—না—

সেতাব বলিল, তোর পায়ে পড়ি মহাতাপ। তোর পায়ে পড়ি। কেলেঙ্কারি বাড়াস নে। যা মানিককে দেখ! ওরে ছোট বউমা আমারই মত বাগানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মানিক একলা ছিল। দেখ। আমি ওর পায়ের বাঁধন কেটে নিয়ে যাচ্ছি। যা।

সে বড় বউয়ের পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিতে বসিল। বলিল, ছি-ছি-ছি!

ওদিকে বাড়ির ভিতর হইতে মানদার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—মানিক! মানিক!

একা মানিক ঘরে শুইয়া ছিল। বিদ্যুতের আলোয় মেঘের ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে মাকে ঘরে পায় নাই। বাহিরে আসিয়াও কাহাকেও পায় নাই। দরজা খোলা হাট। অল্প ছিলকে মেঘ অবশ্য আকাশময়ই কুয়াশার মত দাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে জ্যোৎস্না ঢাকা পড়ে নাই, ম্লানও ঠিক হয় নাই, একটু রহস্যালোকের চেহারা পাইয়াছে। সে সেই আলোয় খোলা দরজার বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ বড় বউয়ের উচ্চকণ্ঠের 'মহাতাপ' ডাকের মধ্যে বড়মায়ের সাড়া পাইয়া 'বড়মা' বলিয়া ডাক দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় বড়মা! সকলেই তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মানদা ঘরে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, মানিক!

কিন্তু কই মানিক?

সে দিশাহারা হইয়া ওই বাগানের খিড়কির পথেই বাহির হইয়া ডাকিল, মানিক!

মহাতাপ ছুটিয়া আসিল—কই—মান্‌কে? জানি না—মানদা কাতর ভাবে স্বামীর দিকে চাহিল।

মহাতাপ দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, কথা শুনতে গিয়েছিলে, ছেলেকে একা রেখে?

মানদা একবার ডাকিল, দিদি।

বাগানের ভিতর হইতে বড় বউ সাড়া দিল—মানু! মানিক!

বাড়িতে নাই।—সে কাঁদিয়া উঠিল।

বড় বউ আসিয়া দাঁড়াইল। সে হাঁপাইতেছিল। তাহার পিছনে সেতাব। বড় বউ চীৎকার করিয়া ডাকিল—মানিক!

সেই মুহূর্তের ঘন কালো ঈশান কোণের মেঘ চাঁদ ঢাকিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল বাতাস—একটা দমকা বাতাস। বাতাসের প্রথম ঝটকাটা চলিয়া গেল। তাহার পর সমান বেগ লইয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। সেই বাতাসের মধ্যে শোনা গেল একটা রঙীন বাঁশির ক্ষীণ আওয়াজ—পু-পু!

বড় বউ বলিল, সদর রাস্তায়। ওই মানিকের বাঁশি।

সদর রাস্তাতেই বাহির হইয়াছিল মানিক। তাহার শিশুমনে চণ্ডী-মণ্ডপে পূজাসমারোহের স্মৃতি। ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সকলে পূজা দেখিতে গিয়াছে। সেই পথেই তাহার বাঁশিটি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল—পু-পু-পু-পু!

অকস্মাৎ জ্যোৎস্না ঢাকিয়া অন্ধকার হইয়া গেল।

মানিক ছুটিতে শুরু করিল।

সেও শুনিতে পাইতেছে বড়মা ডাকিতেছে, বাবা ডাকিতেছে, জ্যেঠা ডাকিতেছে, মা ডাকিতেছে—মানিক! মানিক! মানিক! মানিক!

চণ্ডীমণ্ডপ হইতেই তাহারা ডাকিতেছে তাহাতে তাহার সন্দেহ

নাই। সে ছুটিতে ছুটিতে পথের বাঁকে দাঁড়ায়, রাস্তাটা চিনিয়া লইয়া আবার চলিতে শুরু করে, একবার দুইবার হাতের বাঁশিটা বাজাইয়া লয়।

চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চণ্ডীমণ্ডপে তখন বড় বউ মাথা ঠুকিতেছে।—আমার মানিককে ফিরে দাও। আমার মানিককে ফিরে দাও।

মানিক উল্লাসের সঙ্গে বাঁশিতে ফুঁ দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বড় মায়ের কাছে দাঁড়াইল।

ওদিকে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

পরদিন সূর্য উঠিলেন মনোহররূপে।

বর্ষণসিক্ত রাত্রির শেষে কাটা-কাটা মেঘের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারিয়া পূর্বাকাশে লালে লাল করিয়া পশ্চিম আকাশে রামধনু আঁকিয়া পৃথিবীকে বরবর্ণিনীর মত সাজাইয়া দিয়া দিনের ঠাকুর হাসিতে হাসিতে আবির্ভূত হইলেন।

মণ্ডলবাড়ির সামনে তখন মণিলাল বিদায় লইতেছিল।

যে টোপর-দেওয়া গাড়িখানায় বড় বউয়ের যাইবার কথা, সেই গাড়িখানাতেই মণিলাল একা বাড়ি ফিরিতেছিল।

সেতাব তামাক খাইতেছিল। মণিলাল হাসিয়া বলিল, মাকে কি বলব? শুধাবে তো কি হল? কাদু এল না ক্যানে?

সেতাব বলিল, বলবে! একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, তোমার জামাইকে ভূতে পেয়েছিল। আর কি বলবে? ভূত ছেড়ে গেল। পাঠালে না।

বড় বউ বাড়ির ভিতর হইতে মানিককে কোলে করিয়া আসিয়া বলিল, যাব রে যাব। বলবি মাকে, এই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পরই যাব; আমি, তোর জামাইদাদা দুজনাতেই যাব। ল-সম্বন্ধ করতে যাব। তোর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাব। বলবি, কনে খুব ভাল। বেশ ডাগর। মায়ের সইয়ের মেয়ে। পুটি! তোর জামাইদাদা তো পাগল—

সেতাব বলিল, এই দেখ। এই দেখ! রাধে-রাধে-রাধে! কি যে বল!

বড় বউ হাসিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে মহাতাপ আসিয়া হাজির হইল। তাহার সর্বাঙ্গে কাদা। মাথার ব্যাণ্ডেজ ভিজা, চুল ভিজা, কাঁধে কোদাল। সে ইহার মধ্যে কখন মাঠে গিয়াছিল। সে নিজে মাঠের আল ভাঙিয়া দিয়াছিল; সেই কথা মনে পড়িয়া সে স্থির থাকিতে পারে নাই।

"কর্কট ছরকট, সিংহে শুকা, কন্যা কানে কান,
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথায় রাখবি ধান।"

কর্কট অর্থাৎ শ্রাবণে জলে জল ছরকট করিয়া দিলে, সিংহ অর্থাৎ ভাদ্রে শুকা—রৌদ্র হইলে, কন্যা অর্থাৎ আশ্বিনে আল ভরিয়া কানায় কানায় জল থাকিলে ও তুলা অর্থাৎ কার্তিকে বিনা বাতাসে বর্ষণ হইলে ধান রাখিবার জায়গা কুলায় না খামারে। আশ্বিনে জমির আল কাটা থাকিলে চলে?

এই খনার বচনটাই চাষীরা এমন দিনে গানের সুরে গাহিয়া বলে—

"কর্কট ছরকট, সিংহে শুকা, কন্যা কানে কান,
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথায় রাখবি ধান,
বউ কনে যতন করে নিকাও অঙনখান।"